# মানবজাতির স্রষ্টা যিনি
# বিধানদাতাও একমাত্র তিনি

অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত

অধ্যাপক গোলাম আযম

# মানবজাতির স্রষ্টা যিনি
# বিধানদাতাও একমাত্র তিনি

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

www.amarboi.org

ষষ্ঠ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১১
পঞ্চম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১০
চতুর্থ মুদ্রণ : জুলাই ২০০৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০০৭
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭

মানবজাতির স্রষ্টা যিনি বিধানদাতাও একমাত্র তিনি ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ স্বত্ব : লেখক ❖ প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম ❖ মুদ্রণ : পিএ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র
৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : বাইশ টাকা মাত্র

ISBN 984 8285 61 8

www.amarboi.org

# উৎসর্গ

বাংলাভাষী হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও উপজাতি প্রিয় ভাই-বোনদের জন্যই এ বইটি রচনা করেছি। তাই তাঁদের উদ্দেশ্যেই বইটি উৎসর্গ করলাম।

বাংলাদেশে মুসলিম ও অমুসলিম জনগণ পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। আমাদের কারো মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ নেই। আমরা সবাই নিজ নিজ ধর্ম অবাধে পালন করছি। একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী লোক একমাত্র হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এ চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টায় লিপ্ত; কিন্তু কোনো ধর্মের অনুসারীরাই বিভ্রান্ত না হওয়ায় তেমন সংকট সৃষ্টি হয় না। এটা এ দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য। এ পর্যন্ত কোনো সরকারই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। প্রত্যেক সরকারই সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

আমরা যারা মুসলিম বলে দাবি করি, আসলে আমরা শুধু নামেমাত্রই মুসলিম। কুরআনে মুসলিমের যে গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে, তা যদি আমাদের চরিত্রে প্রকাশ পেত, তাহলে অমুসলিমরাও কুরআনকে জানার জন্য আগ্রহী হতেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষিত যে কয়জন খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের কয়েকজনের সাথে সাক্ষাৎ করে জানতে পেরেছি যে, তারা কুরআন ও মুহাম্মদের জীবনী অধ্যয়ন করার কারণেই ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান পেয়েছেন। তাঁরা মুসলিমদেরকে দেখে নয়; কুরআনকে জেনে এবং মুহাম্মদকে চিনেই মুসলিম হয়েছেন।

আমি আমার দেশের অমুসলিম ভাই-বোনদের বিনীত আহ্বান জানাই, আপনারা আমাদের ত্রুটিপূর্ণ চরিত্র দেখে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করবেন না। আপনারা কুরআন অধ্যয়ন করে সঠিক জ্ঞান অর্জন করুন এবং কুরআনের বাণীবাহক মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ মুহাম্মদ (স)-এর জীবনী পড়ে তাঁর সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করুন।

মুহাম্মদকে জানার জন্য ভারতের মহীসুরস্থ মহারানী মহিলা আর্ট কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান প্রফেসর কেএস রামাকৃষ্ণ রাও লিখিত 'Muhammad : The Prophet of Islam' নামক ৩০ পৃষ্ঠার বইটিই যথেষ্ট। চমৎকার ইংরেজি ভাষায় লেখা বইটি থেকে আমার এ বইটিতে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছি। মুহাম্মদ সম্পর্কে অন্য কোনো অমুসলিম লেখকের বই আমার অন্তরকে এমনভাবে স্পর্শ করেনি। বইটি আমাকে অত্যন্ত অভিভূত করেছে।

আপনাদের হিতকামী
গোলাম আযম

www.amarboi.org

# কুরআন অধ্যয়নে সহায়ক কয়েকটি গ্রন্থ

**১. কোরআন শরীফ :** অনুবাদক ভাই গিরীশচন্দ্র সেন। বাংলা ভাষায় এটাই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। ১৮৮৭ সালে কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত। ১৯৮৭ সালে ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রকাশক, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ৭৩৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত এ গ্রন্থে অনুবাদের সাথে প্রয়োজনীয় টিকা থাকায় কুরআনের মমার্থ বুঝতে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

প্রায় সোয়া শ' বছর পূর্বে প্রাচীন বাংলা ভাষায় লেখা এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে উচ্চ শিক্ষিত আধুনিক বাংলাভাষী তৃপ্তি বোধ না করলেও এর মর্ম বুঝতে সক্ষম হবেন। গ্রন্থকার বিশুদ্ধ সূত্র থেকে টিকাসমূহ সংগ্রহ করায় গ্রন্থটি কুরআন বুঝতে সাহায্য করবে।

**২. সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ :** মূল লেখক, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী। অনুবাদক, অধ্যাপক গোলাম আযম। আরবী ও টিকাসহ তিন খণ্ডে প্রকাশিত। প্রকাশক : কামিয়াব প্রকাশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। একই প্রকাশক সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থটি এক খণ্ডেও প্রকাশ করেছেন। এতে শুধু বাংলা অনুবাদ রয়েছে, আরবী ও টিকা নেই।

যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে ঐ মহামানব মুহাম্মদ সম্পর্কে জানা কুরআন বোঝার জন্য বিশেষভাবে জরুরি। এর জন্য দুটো বইয়ের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে :

**১. প্রিয়তম নবী : গ্রন্থকার শিশির দাস। পরিবেশক, সোহিনী প্রকাশনী, ১০/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯।**

**২. হযরত মুহাম্মদ (স) ও ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ :** ডক্টর এম এ শ্রীবাস্তব হিন্দি ভাষায় বইটি লিখেছেন। বাংলায় অনুবাদ করেছেন মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস। প্রকাশক : কামিয়াব প্রকাশন।

বিশ্ব স্রষ্টা মানুষের উপযোগী পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে কুরআনের মাধ্যমে দীন ইসলাম দান করেছেন। দীন শব্দের অর্থ হলো আনুগত্য। আর ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ। দীন ইসলাম মানে স্রষ্টার আনুগত্যের বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ। দীন ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আমার লেখা **'পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়'** নামক বইটি পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি। এর প্রকাশকও কামিয়াব প্রকাশন।

www.amarboi.org

# এ পুস্তকের ইতিকথা

এক ধার্মিক মুসলিম পরিবারে আমার জন্ম। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী শৈশবেই আরবী ভাষায় মূল কুরআন পড়া শিখি। পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে না বুঝেই রোজ সকালে নিয়মিত কুরআন পড়তাম।

পিতার চাপে বিএ পর্যন্ত আরবী ভাষা অন্যতম পাঠ্য বিষয় থাকায় মোটামুটি ভাষাজ্ঞান লাভ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাস করে ১৯৫০ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে শিক্ষকতার পেশা শুরু করি।

কলেজের দর্শন বিভাগের বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ গুপ্তের সাথে ধর্মের ভিত্তিতে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। আমি তাঁর ছেলের বয়সী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাকে বন্ধু বলে গণ্য করতেন। আমিও তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। কলেজ কম্পাউন্ডেই তাঁর বাসায় আমি যেতাম ও আমার বাসায় তিনি আসতেন। আমরা ধর্মচর্চা করতাম। বিশেষ করে নৈতিক উন্নয়নে ধর্মের অবদান ও স্রষ্টার সাথে ভালোবাসার অনুভূতি আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল।

১৯৫২ সালে গুপ্ত বাবু অবসর গ্রহণ করে কলকাতা চলে যান। যে বাসায় তিনি ৩২ বছর বসবাস করেছেন, সে বাসাটি প্রিন্সিপ্যালকে অনুরোধ করে আমার জন্য বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করেন, যাতে এ বাসায় ধার্মিক লোক থাকে।

## আমার কুরআন অধ্যয়ন

১৯৫৪ সালে আমি 'জামায়াতে ইসলামী' নামক এক সংগঠনের সংস্পর্শে এসে স্রষ্টার বাণী হিসেবে কুরআন অধ্যয়নের গুরুত্ব অনুভব করি। আরবী ভাষা যেটুকু শিখেছিলাম সে পুঁজি নিয়োগ করলাম। 'তাফহীমুল কুরআন' নামক কুরআনের এক ব্যাখ্যাগ্রন্থের সাহায্যে অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করলাম। একটি বছর অবিরাম অধ্যয়নের পর আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে লক্ষ করলাম যে, ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, দর্শন, সংস্কৃতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে কুরআনে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

আমি মুসলিম সমাজে লক্ষ করলাম যে, কোটি কোটি মুসলমান না বুঝেই পুণ্যের আশায় কুরআন পাঠ করে। মুসলিম জনগণের মধ্যে কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপক করার প্রেরণা নিয়ে শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ করে কুরআনের ভিত্তিতে জনগণকে সংগঠিত করতে থাকলাম।

www.amarboi.org

## কুরআনের অনুবাদপ্রচেষ্টা

১৯৮২ সাল থেকে '৯২ সাল পর্যন্ত কুরআনের ১১৪টি সূরা (অধ্যায়)-এর মধ্যে ৭০টির অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা রচনা করলাম। ছোট ছোট অধ্যায়গুলোকেই প্রথমে বাছাই করলাম। এতে কুরআনের মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা গেল। যাতে অল্প শিক্ষিত সাধারণ পাঠক-পাঠিকাও কুরআনের শিক্ষা লাভ করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে আমি অত্যন্ত সহজ বাংলায় লিখেছি।

২০০০ সালের ডিসেম্বরে সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে আমি কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি বই লিখি। উচ্চ শিক্ষিত লোক ছাড়া সাধারণ পাঠক বড় বই পড়তে তেমন আগ্রহী হয় না বলেই এ প্রয়াস।

১৯৯২-৯৩ সালে ১৬ মাস ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে আটক থাকাকালে কুরআনের প্রথম থেকে এক-তৃতীয়াংশের অনুবাদ সম্পন্ন করি। ২০০৩ সালে কুরআনের অবশিষ্ট অংশের অনুবাদ সমাপ্ত হয়।

২০০৫ সাল পর্যন্ত কুরআনের শিক্ষার আলোকে ছোট-বড় অনেক বই লিখেছি। সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য ১২০ পৃষ্ঠার মাঝারি সাইজের একটি বইয়ের মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষার সারমর্ম একসাথে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। কারণ, সর্বসাধারণের পক্ষে অনেক বই পড়া সম্ভব নয়। এ বইটির নাম 'পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়'। কুরআন বোঝা ও বোঝানোর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ৫০ বছর আমার সাধনার কথা এজন্য উল্লেখ করলাম যে, অমুসলিম পাঠক-পাঠিকাগণ যেন উপলব্ধি করেন যে, আমি যা লিখেছি তা শুধু আবেগতাড়িত হয়ে নয়– জ্ঞানের ভিত্তিতেই লিখেছি। যাকিছু লিখেছি তা সবই কুরআনের মর্মকথা। আমার নিজের মনগড়া কোনো কথা এতে নেই। কুরআনের বক্তব্যকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছি মাত্র। এটা কুরআনের অনুবাদ নয়, কুরআনের শিক্ষা।

## অমুসলিমগণের জন্য লেখার চেতনা

এ পর্যন্ত যত কিছু লিখেছি, তাতে মুসলিম সমাজকেই টার্গেট করেছি। বাংলাভাষী অমুসলিম বিরাট জনগোষ্ঠীর নিকট কুরআনের আলো তুলে ধরার জন্য কিছুই করিনি। অথচ কুরআনে বারবার মানবজাতিকে সম্বোধন করে বক্তব্য রাখা হয়েছে এবং সকল মানুষের নিকট এর বাণী পৌঁছানোর জন্য তাকীদ দেওয়া হয়েছে। আমার মধ্যে এ চেতনা জাগ্রত হওয়ায় বেশ কিছু দিন ধরে এ কর্তব্যবোধ আমাকে তাড়া দিচ্ছিল।

www.amarboi.org

এবার (২০০৬) গ্রীষ্মকালে আমার সন্তান-সন্ততির সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আড়াই মাস ইংল্যান্ডে কাটালাম। লন্ডনে ছোট ছেলে ড. সালমানের বাসায় চারপাশে খোলামেলা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় পরিবেশে থাকা অবস্থায় বইটি রচনা করলাম।

মানুষ সৃষ্টির সেরা। স্রষ্টার প্রিয়তম সৃষ্টি এই মানুষ। মানুষের কল্যাণের প্রয়োজনেই স্রষ্টা যুগে যুগে তাঁর বাণীবাহক পাঠিয়েছেন। যারা তাঁর বাণীর সন্ধান পেয়েছে তাদেরকে তিনি অন্য মানুষের নিকট তা পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

মানুষের বাস্তব জীবন ও সৃষ্টিজগতের বহু উদাহরণ উল্লেখ করে বিশ্বস্রষ্টা কুরআনে মানুষকে চমৎকার যুক্তিসহকারে বুঝিয়েছেন যে, পৃথিবীতে সত্যিকার সুখ-শান্তি পেতে হলে স্রষ্টার দেওয়া বিধান অবশ্যই মেনে চলতে হবে। Divine Guidance ছাড়া মানুষ যাকিছু করবে, তাতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলাই বাড়বে।

কুরআনের ঐসব যুক্তিই এ বইটিতে আমি তুলে ধরেছি। কুরআন অধ্যয়ন করলে তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বর্তমান বিশ্বে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা Divine Guidance-এর কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জ্ঞান ও মেধা এবং ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকেই তারা যথেষ্ট মনে করেন। ধর্মকে তারা বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কতক অনুষ্ঠানসর্বস্ব বলেই গণ্য করেন।

কুরআন মানুষের বাস্তব জীবন গড়ার বিধানই দেয়। ধর্মীয় কার্যাবলি ঐ জীবন গড়ার পরিকল্পনারই ভিত্তি। ধর্ম বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। মানুষের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি পরিচালনার জন্য অবশ্যই বিধান প্রয়োজন। কুরআনের মতে, নির্ভুল জীবনবিধান রচনার সাধ্য মানুষের নেই। স্রষ্টার দেওয়া মৌলিক বিধানকে ভিত্তি করে যদি মানুষ বিস্তারিত আইন-বিধান রচনা করে তবেই শান্তিময় জীবন লাভ করতে সক্ষম হবে।

আমি পাঠক-পাঠিকাগণকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মন নিয়ে বইটি পড়ার জন্য অনুরোধ জানাই। বইটি পড়ার পূর্বে একটি কথা গভীরভাবে বিবেচনা করার পরামর্শ রইল। আমরা প্রত্যেকে একাই পৃথিবীতে এসেছি। মৃত্যুর পর একাই আমাদের মহান স্রষ্টার কাছে ফিরে যাব। পার্থিব জীবন সামান্য কয়দিনের। কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী, মৃত্যুর পর অনন্ত অসীম জীবন রয়েছে। সেখানেই আমাদেরকে এ জীবনের কর্মফল ভোগ করতে হবে। এ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা কারো নেই।

www.amarboi.org

মৃত্যু অনিবার্য ও অনস্বীকার্য। জীবনের পরপার থেকে কেউ ফিরে আসেনি। ঐ পারে কী ঘটবে, তা গবেষণা করে জেনে নেওয়ার উপায় নেই। স্রষ্টাই শুধু সে বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী। কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান দান করা হয়েছে। সে জ্ঞান অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও বোধগম্য।

এ বিষয়টি প্রত্যেক মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এটি মোটেই অবহেলা করার মতো বিষয় নয়। এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা অত্যাবশ্যক। মৃত্যুর পূর্বেই এ বিষয়ে জানা প্রয়োজন। আপনার কি এ ব্যাপারে এমন কোনো স্পষ্ট জ্ঞান আছে, যা আপনার অন্তরকে নিশ্চিন্ততা দান করে? যদি থাকে তাহলে আপনি সৌভাগ্যশালী। যদি না থাকে তাহলে কি ব্যাকুল হয়ে ও অধীর আগ্রহ নিয়ে তা জানার জন্য সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য নয়?

'যত দিন জীবন আছে সুখে থাকার চেষ্টা করব, মৃত্যু এলে মরে যাব' এমন ভাবনা নিয়ে যারা সন্তুষ্ট এবং যারা মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে উদাসীন, তাদেরকে এ বইটি হয়তো চিন্তার খোরাক দিতে পারে।

যারা জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও মননশীলতার অধিকারী তারা অবশ্যই চিন্তা করেন যে, মানুষের জীবন পশুর জীবনের মতো উদ্দেশ্যহীন নয়। স্রষ্টা আমাকে কেন সৃষ্টি করলেন, এ পার্থিব জীবনে আমার করণীয় কী, ভালো ও মন্দের যে চেতনা তিনি দান করেছেন এর ভিত্তিতে একদিন তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে কি না, মৃত্যুর পর আমার কী হবে প্রভৃতি প্রশ্ন তাদের মনে অবশ্যই জাগার কথা।

এ জাতীয় মানুষের জন্যই আমি লিখেছি। তারা হয়তো এ বইটিতে ঐসব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। আমি এ আশা নিয়ে লিখেছি যে, এ বইটি আমার অমুসলিম ভাই-বোনদেরকে জীবনে চলার সঠিক পথের সন্ধান পেতে সাহায্য করবে।

## মুসলিম পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট অনুরোধ

এ বইটি অমুসলিমগণের জন্য লিখেছি বলে মুসলিমদের প্রিয়তম মানুষ মুহাম্মদ (স)-এর নামের শেষে দরূদের ইঙ্গিতস্বরূপ '(স)' চিহ্নটি লিখিনি। সকল মুসলিমই এ কথা জানেন যে, এ মহান নামটি উচ্চারণের সাথে সাথে দরূদ পড়া কর্তব্য। তাই তাদেরকে বইটি পড়ার সময় মুহাম্মদ-এর নামের পর দরূদ পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি। অমুসলিমদের উপর এ দায়িত্ব নেই বলেই আমি তা উল্লেখ করিনি। তারা ঐ ইঙ্গিত বুঝতেও পারবেন না।

গোলাম আযম
লন্ডন, আগস্ট ২০০৬

www.amarboi.org

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| মানবজাতির স্রষ্টা যিনি বিধানদাতাও একমাত্র তিনি | ১১ |
| মানুষের আসল পরিচয় | ১১ |
| সৃষ্টিজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ | ১২ |
| বিশ্বস্রষ্টার পরিচয় | ১৩ |
| মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক কী? | ১৫ |
| মানবজাতির জন্য কি জীবনবিধান প্রয়োজন? | ১৬ |
| সৃষ্টিজগতে একমাত্র স্রষ্টার বিধানই চালু রয়েছে | ১৭ |
| স্রষ্টা মানুষকে দুটো জিনিস দিয়েছেন | ১৮ |
| বিশ্বজগৎ মানুষের জন্যই সৃষ্ট | ১৯ |
| স্রষ্টা কি মানুষের জন্য বিধান দেননি? | ১৯ |
| স্রষ্টার বিধান মান্য বা অমান্য করার পরিণাম | ২০ |
| পৃথিবীতে কি সব মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া সম্ভব? | ২১ |
| একটি নৈতিক জগৎ প্রয়োজন | ২১ |
| মানবজাতির জন্য জীবনবিধান প্রয়োজন | ২২ |
| মানবজাতির পক্ষে নির্ভুল জীবনবিধান রচনা করা কি সম্ভব? | ২৩ |
| স্রষ্টা কি কোনো জীবনবিধান দিয়েছেন? | ২৩ |
| হঠাৎ শুনলাম ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনবিধান | ২৫ |
| কুরআন অধ্যয়নের নব প্রেরণা পেলাম | ২৬ |
| কুরআন অধ্যয়ন করে কী পেলাম? | ২৭ |
| কুরআন কি সত্যিই স্রষ্টা বাণী? | ৩০ |
| মানবজাতির প্রতি কুরআনের আহ্বান | ৩২ |
| স্রষ্টার আহ্বানের সারকথা | ৩৩ |
| কুরআন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পদ নয় | ৩৮ |
| মানবজাতি আজ স্রষ্টার প্রদর্শিত পথ থেকে বঞ্চিত | ৪০ |


www.amarboi.org

অশান্তি ও বিপর্যয় সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা ৪১
স্রষ্টা পৃথিবীতেও শাস্তি দিয়ে থাকেন ৪১
স্রষ্টার নির্দিষ্ট কোনো নাম আছে কি? ৪২
মানুষ হিসেবে মুহাম্মদের পরিচয় ৪৩
মুহাম্মদ সম্পর্কে অমুসলিম মনীষীদের অভিমত ৪৩
মুহাম্মদ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৫০
মুহাম্মদ অতিমানব নন ৫০
সমাজসেবক মুহাম্মদ ৫১
ঐশী বাণীবাহক মুহাম্মদ ৫১
ঐশী বাণী-প্রচারক মুহাম্মদ ৫২
মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কায়েমি স্বার্থের প্রতিরোধ ৫৩
ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা ৫৩
মক্কা বিজয় ৫৪
সহজ-সরল জীবনযাপন ৫৪
উন্নততম চরিত্রের অধিকারী ৫৫
নবী-রাসূলের দায়িত্ব কী? ৫৫
উপসংহার ৫৬

www.amarboi.org

## মানবজাতির স্রষ্টা যিনি বিধানদাতাও একমাত্র তিনি

বিশ্বস্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিই মানুষ। তিনি মানুষকে এমন সব গুণ দান করেছেন, যা অন্য কোনো সৃষ্টির মধ্যে দেখা যায় না। স্রষ্টার সৃষ্টিকে আমরা দু প্রকার দেখতে পাই– অগণিত সৃষ্টি প্রাণহীন; অবশিষ্ট সব প্রাণী। প্রাণিজগতে মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীবের নৈতিক চেতনা নেই। কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ– এ চেতনা শুধু মানুষেরই আছে। মানুষের মধ্যে যারা মন্দ কাজ করে তারাও জেনে-বুঝেই মন্দ কাজ করে; মন্দ মনে করে বলেই মন্দ কাজ গোপনে করা প্রয়োজন মনে করে।

আমার আদরের গাভীটি সুযোগ পেলে আমার সামনেই আমার প্রিয় বাগানের গাছ খেয়ে নষ্ট করে। সে বোঝে না যে, এ কাজটি মন্দ। কিন্তু আমার কাজের ছেলেটি আমার জামার পকেট থেকে টাকা চুরি করতে চাইলে আমার সামনে তা করে না। কারণ সে জানে, এ কাজটি মন্দ। ভালো ও মন্দের এ নৈতিক চেতনার কারণেই মানুষ শ্রেষ্ঠ।

### মানুষের আসল পরিচয়

মানুষের মধ্যে আমরা দু রকম সত্তা দেখতে পাই। মানবদেহ হলো মানুষের বস্তুসত্তা। আরেকটি হলো নৈতিক সত্তা। আমরা যেসব পশু-পাখি খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করি, সেসবের মধ্যে যত উপাদান রয়েছে তা মানবদেহে আছে বলেই তা আমাদের দেহে সংযোজন হয়। ঐসব প্রাণীর নৈতিক চেতনা নেই। তেমনি মানবদেহেরও নৈতিক চেতনা নেই। মানবদেহটি অন্যান্য প্রাণীর মতোই বস্তুসত্তা। তাই কেউ চুরি করে রসগোল্লা মুখে দিলেও জিহ্বার নিকট মিষ্টিই লাগবে। কারণ, মানবদেহের ভালো-মন্দ বিচারবোধ নেই।

কিন্তু মানুষের মধ্যে যে নৈতিক সত্তা রয়েছে, তার নিকট চুরি করে খাওয়া রসগোল্লা মিষ্টি মনে হবে না। ঐ সত্তাকেই বিবেক বলা হয়। বিবেক তাকে দংশন করবে। বিবেক বলবে যে, চুরি করে খাওয়া অবশ্যই মন্দ। মানুষ হিসেবে আমাদের এ তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, যখন আমরা দেহের বা প্রবৃত্তির তাড়নায় এমন কোনো কাজ করে ফেলি– যা করা উচিত নয়, তখন নৈতিক সত্তা বা বিবেক দংশন করে। বিবেক আপত্তি জানায় যে, এ কাজটি করা মোটেই উচিত হয়নি। দেহ কাজটির স্বাদ উপভোগ করলেও মন বিষণ্ন হয়।



www.amarboi.org

মানুষের দেহসত্তাকে পশুর মতোই নৈতিক চেতনা থেকে বঞ্চিত বলে বাস্তবে আমরা দেখতে পাই। তাই দেহটা আসল মানুষ নয়; নৈতিক চেতনা বা বিবেকই আসল মানুষ। মনুষ্যত্ব বলতে বিবেকসম্পন্ন কাজই বোঝায়। মানবিক গুণাবলিকেই মনুষ্যত্ব বলা হয়। কোনো ব্যক্তি যখন ব্যাপক মন্দ কাজে লিপ্ত হয় তখন সবাই মন্তব্য করে যে, অমুক লোকটি মানুষই নয়। 'মানুষ' পদবাচ্যের কেউ এমন মন্দ কাজ করতে পারে না।

এ আলোচনা দ্বারা আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, মানুষের আসল সংজ্ঞা বা পরিচয় হলো, নৈতিক জীব। মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয়। সামাজিক জীব শুধু মানুষের পরিচয় নয়, পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গের মধ্যেও অনেক সামাজিক জীব রয়েছে। পিপীলিকারাও সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে। তাই এটা মানুষের আসল পরিচয় নয়। নৈতিক বা বিবেকবান জীবই হলো মানুষের প্রকৃত পরিচয়।

## সৃষ্টিজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

স্রষ্টা মানুষকে এমন কতক গুণ দান করেছেন, যা অন্য কোনো প্রাণীকে দেননি। সবচেয়ে বড় গুণ হলো জ্ঞান ও বুদ্ধি। এ গুণের মাধ্যমে মানুষ গোটা সৃষ্টিজগৎকে জানার যোগ্য হয়েছে। অন্য কোনো জীব জ্ঞানের ক্ষেত্রে সামান্যও এগুতে পারেনি।

মানুষ ছাড়া অন্যসব প্রাণী সহজাতভাবে তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হয়েই জন্মগ্রহণ করে। তাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে হয় না। হাঁসের বাচ্চাকে জন্মের পরই পানিতে ছেড়ে দিলে দেখা যায়, স্রষ্টা তাকে সাঁতারের জ্ঞান দিয়েই সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু মানুষ অনেক চেষ্টা করে সাঁতার শেখে। আমার দাদা আমাকে পুকুরে হাতে ধরে সাঁতার কাটা শিক্ষা দিয়েছেন।

কোন্‌টা খাওয়া উচিত, কোন্‌টা উচিত নয় তা কোনো পশুকে শেখাতে হয় না; কিন্তু মানুষকে শেখাতে হয়। মানবশিশু ভালো-মন্দ যা-ই হাতের কাছে পায় তা-ই মুখে দেয়।

মানুষ ছাড়া সকল প্রাণীই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান সহজাতভাবেই পেয়ে থাকে। জীবন ধারণের জন্য তাদেরকে অতিরিক্ত জ্ঞান শিক্ষা করতে হয় না। মানুষই একমাত্র প্রাণী, যাকে শৈশবকাল থেকেই সব কিছু শিক্ষা দিতে হয়। তার জ্ঞান আহরণ কখনো শেষ হয় না। সে আজীবনই জ্ঞান চর্চা করতে থাকে এবং তার জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি এক যুগে মানুষ যতটুকু জ্ঞান অর্জন



www.amarboi.org

করে তা সংরক্ষণ করে রাখতে পারে বলেই এর ভিত্তিতে পরবর্তী যুগের মানুষ জ্ঞানের দিক দিয়ে আরো অগ্রসর হয়।

বুদ্ধি, মননশীলতা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে মানুষ জ্ঞানের যে বিরাট শক্তি অর্জন করেছে, এর ফলে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। মানুষ উপলব্ধি করছে যে, জ্ঞানই শক্তি। এ শক্তির বলেই বিরাটকায় পশু ও মহাশক্তিমান জন্তুকে মানুষ পোষ মানাতে সক্ষম। আকাশে উড্ডীয়মান দ্রুততম পাখির চেয়েও মানুষ অধিক দ্রুত উড়তে পারছে, সবচেয়ে দ্রুতগামী পশুর চেয়েও অনেক বেশি বেগে মানুষ গাড়িতে চলছে এবং দ্রুততম জলজপ্রাণীর চেয়েও অধিক দ্রুত বেগে মানুষ সমুদ্রে বিচরণ করছে।

মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী বিজ্ঞান চর্চা করতে সক্ষম নয়। স্রষ্টা এ যোগ্যতা শুধু মানুষকে দান করেছেন। গোটা বিশ্ব এখন মানুষের নিয়ন্ত্রণে। এমনকি পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে, গ্রহ-উপগ্রহে মানুষ বিচরণ করছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মানুষ এমনভাবে আলাপ-সালাপ করছে, যেন পাশের মানুষের সাথে বসে কথা বলছে। বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষকে আরো কত শক্তির অধিকারী করবে তা কল্পনা করেও কূল-কিনারা পাওয়া যাবে না।

মানুষ শুধু শ্রেষ্ঠ জীবই ন;, সেরা সৃষ্টি। বিশ্বজগৎকে ব্যবহার করার যোগ্যতা শুধু মানুষকে দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টিজগতে এমন কোনো শক্তি নেই, যে মানুষের উপর কর্তৃত্ব করতে সক্ষম। মানুষই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সৃষ্টি। জ্ঞানই এ শক্তির উৎস।

## বিশ্বস্রষ্টার পরিচয়

মানুষকে স্রষ্টা যে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে সৃষ্টিজগৎ থেকেই স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি মানুষকে এত বুদ্ধি, জ্ঞান ও শক্তি দান করেছেন, তাঁর বুদ্ধি, জ্ঞান ও শক্তি কত সীমাহীন তা উপলব্ধি করার সাধ্য কারো নেই। তাঁর সৃষ্টিজগতের দিকে জ্ঞান-বুদ্ধির দৃষ্টিতে তাকালে বিস্মিত হতে হয়। গোটা সৃষ্টিলোকে কঠোর নিয়মের রাজত্ব চলছে। তাঁর সৃষ্টিতে কোথাও সামান্যতম বিশৃঙ্খলাও নেই। বিজ্ঞানীরা ঐ নিয়মগুলোকেই জানার সাধনা করেন এবং তা মানুষের কাজে প্রয়োগ করেন। অজানা নিয়মকে জানাই বিজ্ঞানের কাজ। কোনো নতুন নিয়ম সৃষ্টি করা বা স্রষ্টার কোনো নিয়ম পরিবর্তন করার ক্ষমতা বিজ্ঞানের নেই।


www.amarboi.org

তাই সাধারণত বিজ্ঞানীরা নাস্তিক হন না। তাঁরা সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে যে নিয়মের রাজত্ব দেখতে পান তাতেই তারা বিস্মিত হয়ে স্রষ্টার পরিচয় পেয়ে যান। আজ (২০০৬) থেকে ৪৫ বছর পূর্বে জনাব মুহাম্মদ আবদুস সালাম নামক লন্ডনপ্রবাসী আমার এক বন্ধু 'The Evidence of God in An Expanding Universe' নামে একটি বই পাঠান। বইটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণারত ৪০ জন আমেরিকান বিজ্ঞানীর নিজ নিজ শাখায় গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা প্রবন্ধের সংকলন। তাঁরা নিজ নিজ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যকে পরিবেশন করে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছেন যে, একমাত্র মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিমান, মহাকুশলী ও নির্ভুল পরিকল্পনাকারী সত্তাই বিশ্বের স্রষ্টা।

প্রায় ৪০ বছর আগে ঢাকাস্থ 'ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রাম' বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে। নাম দেওয়া হয় 'চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব'। এর আগে বইটির উর্দু অনুবাদ পেয়েছি। নাম রাখা হয় 'খোদা মওজুদ হ্যায় : চালিস্ সাইনস্‌দানো কী শাহাদাত' (খোদা আছেন : চল্লিশ জন বিজ্ঞানীর সাক্ষ্য)।

মানুষ নিজের দেহের দিকে লক্ষ করলেই দেখতে পাবে যে, কত সূক্ষ্ম নিয়ম এ দেহে চালু রয়েছে। এর কোনো নিয়ম মানুষ নিজে বানায়নি। স্রষ্টার দেওয়া নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই দেহ অসুস্থ হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানী বা ডাক্তার আসল নিয়মটা বহাল করার ব্যবস্থা করলে দেহ আবার সুস্থ হয়। স্রষ্টার রচিত নিয়ম মেনে চললেই দেহ সুখ বোধ করে, অনিয়ম হলেই অসুখ হয়।

সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার পরিচয় স্পষ্ট। সৃষ্টি সম্পর্কে যারা চিন্তা-গবেষণা করেন তারা মহাকুশলী স্রষ্টার অস্তিত্বে সন্দেহ করেন না। তারা মনের চোখে স্রষ্টাকে দেখতে পায়। দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে নাস্তিক হয়। সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে গবেষণা না করে চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করতে গিয়ে যারা স্রষ্টাকে তালাশ করে নাগাল পায় না তারাই নাস্তিক হয়। তবে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। বিশ্বের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের মধ্যে কয়জন নাস্তিক? বিখ্যাত বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, মহাবীর, শাসক প্রায় সবাই আস্তিক।

মানবজীবনে আপদ-বিপদ, দুঃখ-বেদনা, অসুখ-বিসুখ নিত্যসাথী। মানুষ যখন সব দিক থেকে হতাশ হয়, তখন যাঁর আশ্রয় তালাশ করতে বাধ্য হয় তিনিই মহান স্রষ্টা। মানুষের অবচেতন মনে স্রষ্টা সর্বদা উপস্থিত। জড়দেহের তাড়নায় রূপ-রস-গন্ধেভরা বস্তুজগতের আকর্ষণে মানুষ সাময়িক মোহে স্রষ্টাকে ভুলে


www.amarboi.org

থাকে; কিন্তু জীবনে এমন মুহূর্ত আসে, যখন অন্তরে স্রষ্টার সন্ধান পেয়ে যায়। স্রষ্টার পরিচয় অস্পষ্ট নয়; বিবেকসত্তায় সদা উপস্থিত।

ছাত্রজীবনের আমার এক ঘনিষ্ঠ কমিউনিস্ট বন্ধু হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আছে জেনে দেখতে গেলাম। বয়স ষাটের উপর। বেডে বসা অবস্থায় তাকে পেলাম—কিছুটা সুস্থতা বোধ করছে। আমাকে টেনে পাশে বসাল এবং আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ভাই দোআ করো'। তাকে নাস্তিক বলে জানতাম। বুঝলাম, সংশয় কেটে গেছে। 'কার কাছে দোআ করব?' এমন নিষ্ঠুর প্রশ্ন করতে পারলাম না। মায়া লাগল, বন্ধু তো!

## মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক কী?

সবাই স্বীকার করে যে, তিনি স্রষ্টা, আমি তাঁর সৃষ্টি; কিন্তু তিনি যে প্রতি মুহূর্তে আমাকে লালন-পালন করছেন তা সকলে সচেতনভাবে বিবেচনা করে না। আমি যখন মায়ের পেটে ভ্রূণ অবস্থায় ছিলাম তখন থেকে এ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণে আমাকে একমাত্র তিনিই প্রতিপালন করে চলেছেন। মায়ের পেটে মা আমার দেহ গড়ে তোলেননি। জন্মের পর মায়ের বুকে কে আমার খাবার তৈরি করেছে? একটু বড় হলে মা আমার মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন; কিন্তু কে হজম করিয়ে দেহকে পুষ্ট করেছে? দুক্ দুক্ করে যে হৎপিণ্ড নড়ছে তা কে চালু রেখেছে? নিঃশ্বাস বন্ধ হলেই শেষ— কে তা সচল রেখেছে? একটু চিন্তা করলেই বিবেক স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠবে, 'তিনিই আমার প্রতিপালক'।

আরো একটু এগিয়ে চিন্তা করলেই মানুষ অনুভব করতে পারে যে, এ পৃথিবীটা স্রষ্টারই রাজ্য। তিনিই এর রাজা। তাঁর রাজত্বের বাইরে চলে যাওয়ার সাধ্য আমার নেই। তিনি আমার শুধু প্রতিপালকই নন, তিনি আমার রাজা; আমি তাঁরই প্রজা। তিনি আমার শুধু দেহেরই স্রষ্টা নন, তিনি আমার বিবেকেরও স্রষ্টা। তিনি আমাকে ভালো ও মন্দের নৈতিক চেতনা দান করেছেন।

এটাই স্বাভাবিক যে, আমি যদি বিবেকের কথামতো চলি তাহলে আমার রাজা খুশি হবেন। আর যদি বিবেকের বিরুদ্ধে চলি তাহলে তিনি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন। তিনি আমাকে বিবেকহীন পশু হিসেবে সৃষ্টি করেননি। পশুর মতো আচরণ করার জন্য আমাকে বিবেকবান বানাননি। আমার মন বলছে যে, আমার বিবেকের কথামতোই চলা উচিত। বিবেকের বিরুদ্ধে চললে আমি 'মানুষ' পদবাচ্য থাকব না, বিবেকহীন 'পশু' হয়ে যাব।


www.amarboi.org

সকল মানুষই যদি নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিবেকের কথামতো চলে, তাহলে মানবসমাজে সবাই সুখ-শান্তি ভোগ করবে। মানবসমাজে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে, এর কারণ কী? বিবেকের বিরুদ্ধে চলার কারণেই যে সবাই অশান্তি ভোগ করছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সকল মানুষই শান্তি চায়। শান্তি চায় না এমন কোনো মানুষ থাকতে পারে না। এর চেয়ে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার, প্রত্যেকেই শান্তি চায় অথচ অনেকেই তা পাচ্ছে না। না পাওয়ার কারণ তালাশ করলে এ কথাই আবিষ্কৃত হবে যে, যা করা উচিত নয় বলে সবাই জানে, অধিকাংশ লোকই তা করছে। শতকরা এমন কত জন লোক পাওয়া যাবে, যারা বিবেকের বিরুদ্ধে চলে না?

প্রমাণিত হলো যে, স্রষ্টার দেওয়া নৈতিক চেতনা অগ্রাহ্য করলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, পশুতে পরিণত হয়। মানুষ যদি নিজেকে স্রষ্টার প্রজা মনে করত তাহলে এমনটা হতো না। পৃথিবীর জীবনে শান্তি পেতে হলে এ রাজ্যের রাজার অনুগত প্রজা হিসেবে সচেতন হয়ে নৈতিক বিধান মেনে চলতেই হবে। এ ছাড়া এ রাজ্যে শান্তি ভোগ করার কোনো উপায় নেই।

## মানবজাতির জন্য কি জীবনবিধান প্রয়োজন?

স্রষ্টা মানুষকে যে নৈতিক চেতনা দান করেছেন, তা কি যথেষ্ট? মানুষের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ হওয়ার জন্য কোনো বিধানের প্রয়োজন আছে কি না?

এ প্রশ্নের জবাব আমরা সহজেই পাই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সব দেশেই এসবের জন্য বিধান রচনা করা হয়। এমনকি কোনো সমিতি গঠন করলেও এর পরিচালনার জন্য নিয়ম-কানুন প্রয়োজন হয়। স্কুল, কলেজ বা যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে সন্তোষজনভাবে পরিচালনার জন্য বিধি-বিধান রচনা করতে হয়। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদির জন্যও অবশ্যই বিধানের প্রয়োজন। প্রয়োজন বলেই সব দেশে সব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানই বিধান রচনা করে থাকে।

আমরা লক্ষ করছি যে, মানবজাতির মধ্যে একই রকম বিধান চালু নেই। অথচ মানবপ্রকৃতি তো একই। জীব হিসেবে বিশ্বের সকল জীবের প্রকৃতি সব দেশেই এক রকম। সব দেশের কাকেরই প্রকৃতি এক প্রকার। স্রষ্টা যে জীবকে যে স্বভাব-প্রকৃতি দান করেছেন, সব দেশে তা একই রকম। মানুষের বেলায়ও ব্যতিক্রম নয়। সহজাত প্রকৃতির দিক দিয়ে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই।


www.amarboi.org

সমাজ ও পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে বাহ্যিক গুণাবলি ও যোগ্যতায় মানুষে মানুষে যত পার্থক্যই দেখা যাক, জন্মগত বা সৃষ্টিগত দিক দিয়ে মানবপ্রকৃতি সারা বিশ্বে একই রকম। সুখ-দুঃখের চেতনা, হাসি-কান্নার ধরন, অনুরাগ ও বিরাগের কারণ, প্রেম ও ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানবপ্রকৃতিতে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

তাহলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে একই রকম বিধান উপযোগী হওয়ার কথা; কিন্তু বাস্তবে দেশে দেশে প্রচলিত বিধানে বিরাট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এর কারণ তালাশ করলে আমরা এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে বাধ্য হব যে, এসব বিধান মানবরচিত। মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রচলিত বিধান পরিবর্তন করতে থাকে। এভাবেই বিভিন্ন ধরনের বিধি-বিধান বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছে। এমনকি একই দেশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বিধানেও বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়।

## সৃষ্টিজগতে একমাত্র স্রষ্টার বিধানই চালু রয়েছে

বস্তুজগৎ, প্রাণিজগৎ ও প্রকৃতিজগৎ— গোটা বিশ্বে একই রকম বিধান চালু রয়েছে। এর কারণ, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ঐসব বিধান রচনা করে চালু করে দিয়েছেন। কোনো বস্তু বা কোনো জীবই নিজেদের জন্য বিধান রচনা করতে সক্ষম নয়। ক্ষুদ্রতম বস্তু 'এটম' থেকে শুরু করে আমাদের সৌরজগতের মধ্যে বৃহত্তম সৃষ্টি 'সূর্য' পর্যন্ত প্রতিটি বস্তুর জন্যই স্রষ্টা বিধান দিয়েছেন। পিপীলিকা থেকে হাতি পর্যন্ত স্রষ্টা সকল জীবের জন্যই যার যার উপযোগী জীবনবিধান দিয়েছেন। তৃণলতা থেকে বটবৃক্ষ পর্যন্ত সবার জন্যই তিনি বিধান দিয়েছেন। এসব সৃষ্টির কোনোটিই নিজেদের জন্য বিধান রচনা করতে সক্ষম নয় এবং তাদের জন্য স্রষ্টার রচিত বিধানে সামান্য রদবদল করারও কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। তাই অনন্তকাল থেকে প্রতিটি সৃষ্টিই তার স্রষ্টার রচিত বিধান বাধ্য হয়ে মেনে চলছে। এ কারণেই গোটা বিশ্বে প্রতিটি সৃষ্টি একই রকম বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

স্রষ্টা কিন্তু মানুষের দেহের বেলায়ও বিশ্বের সব মানুষের জন্য একই রকম বিধান দিয়েছেন। দেখার নিয়ম, শোনার নিয়ম, বলার নিয়ম, শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম, ঘুমের নিয়ম, পেশাব-পায়খানার নিয়ম, রক্ত চলাচলের নিয়ম, খাদ্য হজম হওয়ার নিয়ম ইত্যাদি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য একই রকম। এসবের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোনো ক্ষমতা মানুষের নেই। কারণ, মানবদেহটি আসল মানুষ নয়। আকার, যোগ্যতা ও গুণাবলিতে যত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীই হোক–


www.amarboi.org

মানবদেহ অন্যান্য পশুর মতোই একটি পশু মাত্র। সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টির মতো মানবদেহটিও স্রষ্টার রচিত বিধান মেনে চলতে বাধ্য।

আসল মানুষ হলো নৈতিক চেতনাসম্পন্ন বস্তুহীন পৃথক এক সত্তা। ভালো ও মন্দকে চেনার যে শক্তি, সেটাকে ভালো বা মন্দ কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মানুষকে ভালো কাজ করতে যেমন বাধ্য করা হয়নি, মন্দ কাজ করার জন্যও বাধ্য করা হয়নি। এই যে ইচ্ছাকৃতভাবে চলার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয়েছে, এমন স্বাধীনতা অন্য কোনো সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি। মানুষের এ বৈশিষ্ট্য একদিকে যদিও তাকে সেরা সৃষ্টির মর্যাদা দিয়েছে, অপরদিকে ইচ্ছার স্বাধীনতা তাকে সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হওয়ারও সুযোগ দিয়েছে।

## স্রষ্টা মানুষকে দুটো জিনিস দিয়েছেন

নৈতিক চেতনাসম্পন্ন, বিবেক শক্তির অধিকারী এবং ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের যোগ্যতার মালিক মানুষকে স্রষ্টা দুটো জিনিস দান করেছেন :

**১. বিশ্বজগৎ :** গোটা সৃষ্টিজগৎকেই ব্যবহার করা বা কাজে লাগানোর ক্ষমতা ও অধিকার একমাত্র মানুষকেই দেওয়া হয়েছে।

**২. দেহযন্ত্র :** ঐ বিরাট ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ করার উপযোগী হাতিয়ার হিসেবে দেহযন্ত্রটি দান করা হয়েছে। মানুষ পৃথিবীতে যাকিছু করতে চায়, ভালো হোক আর মন্দ হোক, সব কিছুই এ দেহের সাহায্যেই করে থাকে। মানুষ দেহটির মালিক নয়। স্রষ্টাই এর মালিক। যখন তিনি চান তখন তিনি দেহযন্ত্রটি ছিনিয়ে নেন। মানুষ শুধু দেহটি ব্যবহার করার অধিকারী, এর মালিকানার অধিকারী নয়।

বিশ্বে মানুষ যে বিস্ময়কর যোগ্যতার বলে গোটা সৃষ্টিজগৎকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে, এর কৃতিত্ব ঐ দেহযন্ত্রটির প্রাপ্য। মানুষ যখন দেহযন্ত্রটিকে বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করে, তখন তার সকল কর্ম মানবসমাজের জন্য কল্যাণকর হয়। তার যাবতীয় কর্মতৎপরতা মানবজাতির জীবনে সুখ-শান্তি ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে। কিন্তু দেহযন্ত্রের বিরাট ক্ষমতাকে যখন মানুষ বিবেকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তখন তা মানবসমাজে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও যাবতীয় অকল্যাণ ডেকে আনে; এমনকি প্রাকৃতিক জগতের ভারসাম্য পর্যন্ত বিনষ্ট করতে সক্ষম হয়।



www.amarboi.org

## বিশ্বজগৎ মানুষের জন্যই সৃষ্ট

এ পৃথিবীর সবকিছু মানুষের ব্যবহারের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য কোনো সৃষ্টির ব্যবহারের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। এর দ্বারা সৃষ্টিজগতে মানুষকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বাতাস, পানি, গাছপালা, পশু-পাখি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না; কিন্তু মানুষ না থাকলে এসবের কোনো ক্ষতি নেই। অর্থাৎ, মানুষের ব্যবহারের জন্যই এসবকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ এসবের কোনো কাজে লাগে না; বরং মানুষ না থাকলে পশু-পাখির জন্য হয়তো ভালোই হতো। কোনো সৃষ্টির সামান্য কল্যাণের জন্যও মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি; অথচ সকল সৃষ্টিকেই একমাত্র মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

## স্রষ্টা কি মানুষের জন্য বিধান দেননি?

আমরা লক্ষ করছি যে, স্রষ্টা প্রতিটি বস্তু ও জীবের জন্য এর উপযোগী বিধি-বিধান রচনা করে তা বাস্তবে চালু করে দিয়েছেন; মানবদেহের জন্যও বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ বিধান দান করেছেন। বিশ্বে তাঁরই রচিত বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন সৃষ্টিজগৎকে পরিচালনা করছে।

তিনি মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেকসহ সুগঠিত দেহ ও বিশাল সৃষ্টিজগৎ দান করেছেন। দেহের যোগ্যতা ও গুণাবলিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য এবং সৃষ্টিজগৎকে ঠিকমতো ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে কি তিনি কোনো বিধান দান করেননি? তিনি সকল সৃষ্টির জন্য বিধান দিলেন, আর তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে কোনো বিধান দেননি— এ কথা কি আমাদের বিবেক মেনে নিতে পারে? এটা কি যুক্তির দাবি হতে পারে?

বিশেষ করে মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির যে ক্ষমতা মানুষ পেল, তা যাতে বিবেকের নিয়ন্ত্রণে থাকে সে উদ্দেশ্যে মানুষকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য স্রষ্টার পক্ষ থেকে বিধান পাওয়া কি স্বাভাবিক নয়? মানুষের দেহযন্ত্রকে মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহার করা ও অকল্যাণের পথ পরিহার করার বিধান না দিয়েই স্রষ্টা কেমন করে মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিলেন?

স্রষ্টার কোনো কাজই অযৌক্তিক বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুধু মানুষের বেলায় কি তিনি অযৌক্তিক হতে পারেন? মহান স্রষ্টা সম্পর্কে এমন ধারণা করতে বিবেক সায় দেয় না। তাহলে যুক্তির দাবি হিসেবে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য


www.amarboi.org

যে, স্রষ্টা নিশ্চয়ই মানুষকে তার বিবেক ও ইচ্ছাশক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য বিধান দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সঠিক পথের তালাশে অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে চলার জন্য ছেড়ে দেননি।

কোন্‌টা কল্যাণ, আর কোন্‌টা অকল্যাণ— এ জ্ঞান মানুষ কোথায় পেল? মানুষ কল্যাণের পথে চলবে, না অকল্যাণের পথে, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তো তিনিই দিয়েছেন। বিবেকের দাবিকে অগ্রাহ্য করে যারা মানবসমাজের অকল্যাণ করে তাদের প্রতি স্রষ্টা অবশ্যই অসন্তুষ্ট হন। তিনি অবশ্যই মানুষের জন্য বিধান দিয়েছেন। তবে তা মেনে চলা বা না চলার সিদ্ধান্ত মানুষই নিয়ে থাকে।

মানবসমাজে মঙ্গল ও অমঙ্গল এবং উচিত ও অনুচিতের যে জ্ঞান তা অবশ্যই স্রষ্টার দান। যিনি মানুষকে বিবেক দিয়েছেন, তিনি প্রয়োজনীয় জ্ঞানও দান করেছেন।

## স্রষ্টার বিধান মান্য বা অমান্য করার পরিণাম

স্রষ্টা মানুষকে বিবেক দিয়েছেন এবং ভালো ও মন্দ চেনার ক্ষমতা দিয়েছেন; কিন্তু ভালো বা মন্দ কোনোটাই করতে বাধ্য করেননি। তিনি মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই যা ভালো তা করাই তিনি পছন্দ করেন। এটাই তাঁর বিধান। মন্দ অবশ্যই তিনি অপছন্দ করেন। মানুষও মন্দকে অপছন্দ করে। মন্দ জানাই তো অপছন্দের প্রমাণ। মন্দ জেনেও মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় মন্দ কাজ করে ফেলে। মন্দ কাজ করা যে অপছন্দনীয় তা কে অস্বীকার করে?

যা ভালো তা করা এবং যা মন্দ তা না করাই স্রষ্টার বিধান। এ বিধান মেনে চললে মানবসমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বহাল থাকে এবং অমান্য করলে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা চালু হয়।

ভালো কাজের ফল ভালো হওয়াই স্বাভাবিক এবং মন্দ কাজের ফলও মন্দ হওয়ারই কথা। কেউ ভালো কাজ করলে মন্দ লোকও তার প্রশংসা করে; কিন্তু কেউ মন্দ কাজ করলে মন্দ লোকও তার প্রশংসা করে না।

কেউ মন্দ কাজ করলে সবাই চায় যে, তার শাস্তি হোক। তাই মন্দ কাজের জন্য শাস্তির আইন সব দেশেই আছে। যে মন্দ কাজ করে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করার জন্য তালাশ করে। ধরা পড়লে এবং আদালতে দোষ প্রমাণিত হলে সে শাস্তি পায়।


www.amarboi.org

তাহলে দেখা গেল, মানবসমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল রাখতে হলে স্রষ্টার বিধান মেনে চলা প্রয়োজন। কোনো মানুষ অশান্তি চায় না। যে মন্দ কাজ করে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে সেও নিজের জীবনে শান্তি চায়। তাই সকল সমাজেই শান্তি কায়েম রাখার প্রয়োজনে মন্দ কাজ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আইন রচনা করা হয় এবং আদালতের মাধ্যমে শান্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

## পৃথিবীতে কি সব মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া সম্ভব?

যত চেষ্টাই করা হোক, এ পৃথিবীতে সব মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয় না। এর অনেক সঙ্গত কারণও রয়েছে :

১. যারা মন্দ কাজ করে তারা ধরা না পড়ার উদ্দেশ্যে অনেক হিসাব-নিকাশ করে কাজটি সম্পন্ন করে। তাই সবাই ধরা পড়ে না। ধরা না পড়লে শাস্তি দেওয়ার কোনো সুযোগই নেই।

২. ধরা পড়লেও সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে এবং আইনের ফাঁক-ফোকরে শাস্তি থেকে বেঁচে যায়।

৩. সাক্ষী-প্রমাণ পেলেও অন্যায় যে পরিমাণ করেছে, সে হিসাবমতো শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না। এক ব্যক্তিকে একটি খুনের শাস্তিস্বরূপ ফাঁসি দেওয়া গেল; কিন্তু কেউ তিনটি খুন করলে কি তাকে তিন বার ফাঁসি দেওয়া সম্ভব? একজন সন্ত্রাসী কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে খুন করলে যে পরিমাণ অন্যায় হলো সে পরিমাণ শাস্তি কি দেওয়া সম্ভব?

৪. আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে যারা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে মিথ্যা অজুহাতে আফগানিস্তান ও ইরাকে গণহত্যার মতো জঘন্য অমানবিক কর্মে লিপ্ত হয়েছে, তাদেরকে এ পৃথিবীতে শাস্তি দেওয়ার সাধ্য কার?

৫. ক্ষমতার দাপটে যেসব শাসক জনগণের উপর জুলুম করে, সরকারি দায়িত্ব পালনের সুযোগে যারা দুর্নীতি করে মানুষকে শোষণ করে, ঘুষ খেয়ে যে বিচারক দোষীকে ছেড়ে দেয়– এ জাতীয় জঘন্য অপরাধীদেরকে পৃথিবীতে শাস্তি দেওয়ার কি কোনো উপায় আছে?

## একটি নৈতিক জগৎ প্রয়োজন

এ পৃথিবীটা বস্তুজগৎ মাত্র। এখানে যেকানো বস্তুগত কাজের বস্তুগত ফল প্রকাশ পায়, নৈতিক ফল প্রকাশ পায় না। মানুষ নৈতিক জীব। সে যখন মন্দ কাজ করে তখন সে নৈতিক অন্যায় করে; কিন্তু তার মন্দ কাজের বস্তুগত ফলই শুধু দেখা যায়। নৈতিক কোনো ফল দেখা যায় না।


www.amarboi.org

যেমন– কেউ আগুন দিয়ে কারো বাড়ি পুড়িয়ে দিল। বস্তুগত ফল হলো বাড়িটি জ্বলে গেল। কিন্তু যে এ নৈতিক অন্যায় করল তার হাত পুড়ে যায়নি। এ অনৈতিক কাজের কোনো নৈতিক ফল প্রকাশ পেল না। যদি ধরা না পড়ে তাহলে তো কোনো শাস্তিই পেল না। ধরা পড়লেও সাক্ষী-প্রমাণ না পেলে বিনা শাস্তিতেই ছাড়া পেয়ে যাবে। যদি তাকে জেল দেওয়াও সম্ভব হয়, তবুও যার বাড়ি সে পুড়িয়ে দিল তার প্রতি যে নৈতিক অন্যায় করা হলো, তার যে আর্থিক ক্ষতি হলো, তার যে মনোকষ্ট হলো– এ সবের কোনো ফলই দুনিয়ায় প্রকাশ পেল না।

হিটলার জার্মান জাতিকে বিশ্বজয়ের প্রেরণা দিয়ে বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে যে মহাবিপর্যয় সৃষ্টি করলেন, এর কোনো শাস্তি কি পৃথিবীতে দেওয়া সম্ভব?

১৯৪৮ সালে ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া ফিলিস্তিনে হাজার বছর ধরে বসবাসকারীদের উৎখাত করে ইহুদিদের রাষ্ট্র কায়েম করার ব্যবস্থা করলেন। সে রাষ্ট্রটি আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় লাখ লাখ জনগণের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে কি এসব বড় বড় নৈতিক অপরাধের কোনো প্রতিকার সম্ভব?

তাই বিবেকের দাবি এটাই যে, নৈতিক জীব হিসেবে মানুষ যে অনৈতিক কাজ করে, এর উপযুক্ত শাস্তির জন্য মৃত্যুর পর একটি নৈতিক জগৎ থাকা প্রয়োজন। যুক্তির অপরিহার্য দাবি অনুযায়ী সকল ধর্মেই পরকালে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। স্বর্গ ও নরক, Hell and Heaven এবং বেহেশত ও দোযখের কথা সব ধর্মেই আছে।

## মানবজাতির জন্য জীবনবিধান প্রয়োজন

স্রষ্টা মানুষকে যে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন– মানবজাতির জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা, সুবিচার ও পারস্পরিক সুস্থ সম্পর্কের জন্য কি ঐটুকুই যথেষ্ট? ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের জন্য কি কোনো বিধানের প্রয়োজন নেই?

প্রয়োজন আছে বলেই তো সব দেশেই মানুষ এসব ক্ষেত্রের জন্য স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী বিধান রচনা করেছে। তবে মানবরচিত বলে এসব বিধান নির্ভুল নয়। তাই কিছু দিন পরপরই তা সংশোধন করতে হয়। আবার ভুল ধরা পড়ে। আবার সংশোধন করা হয়।

মানবরচিত বলেই স্থায়ী ও শাশ্বত বিধান রচনা করা সম্ভব হয় না। মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো ভবিষ্যৎজ্ঞানের অভাব। মানুষ এখন যা সঠিক মনে করছে এর ভিত্তিতেই বিধান রচনা করছে। এর পরিণাম ভবিষ্যতে কেমন দেখা যাবে সে বিষয়ে সঠিক ধারণা করতে মানুষ অক্ষম।


www.amarboi.org

মানবরচিত বলেই সব দেশের বিধান এক রকম নয়। অথচ মানবপ্রকৃতি তো সব দেশে একই। মানবজাতির মধ্যে যদি একই রকম বিধান ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে চালু হয় তাহলে বিশ্বে পূর্ণ শান্তি কায়েম হতে পারে। আর যদি সে বিধান নির্ভুল হয় তাহলে বারবার তা পরিবর্তন করতে হবে না।

## মানবজাতির পক্ষে নির্ভুল জীবনবিধান রচনা করা কি সম্ভব?

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই মানুষের পক্ষে নির্ভুল জীবনবিধান রচনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। নির্ভুল বিধান রচনা করার জন্য অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান প্রয়োজন। আর এ জাতীয় জ্ঞান মানুষের নেই।

নির্ভুল না হলেও অন্তত সবার নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো বিধান রচনা করাও কি সম্ভব? প্রথম প্রশ্ন হলো, এমন কোনো মানুষ কি পাওয়া সম্ভব, যার উপর সব মানুষের আস্থা আছে? এক দেশে রচিত বিধান অন্য দেশ কেন মেনে নেবে?

সব দেশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কোনো সংগঠনেও মানবজাতির জীবনবিধান রচনা করা সম্ভব হবে না। কারণ, প্রত্যেক দেশে যে বিধান রয়েছে, এসবের সমন্বয় করতে চেষ্টা করলে যেসব দেশের বিধানে পরিবর্তন আসবে, সেসব দেশ তা সহজে মেনে নেবে না।

অথচ মানবজাতির জন্য একই রকম জীবনবিধান হলে সারা বিশ্বে সহজেই শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব; কিন্তু এমন জীবনবিধান রচনা করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। যদি কোনো রকমে তা সম্ভব হয়ও তা কিছুতেই নির্ভুল হবে না। তাই নির্ভুল জীবনবিধান একমাত্র স্রষ্টার পক্ষেই রচনা করা সম্ভব।

## স্রষ্টা কি কোনো জীবনবিধান দিয়েছেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ পড়ার সময় 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' আমার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় বলে সাব্যস্ত হয়। তাই এ বিষয়েই এমএ পড়ি। ১৯৪৬ সালে বিএ পাস করে এমএ-তে ভর্তি হই। এর মাত্র এক বছর আগে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ হয়। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা পত্রিকায় পড়ে মনে প্রশ্ন জাগে, যুদ্ধ-বিগ্রহ কি স্থায়ীভাবে বন্ধ হতে পারে না?

ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হেরল্ড জে. লাস্কির 'দি গ্রামার অব পলিটিক্স' গ্রন্থের একটি কথায় ঐ প্রশ্নের আংশিক জবাব পাই। কথাটি হলো, 'We must think internationally, or we perish.

তাঁর বক্তব্য হলো, আমরা যদি ধ্বংস থেকে বাঁচতে চাই তাহলে শুধু নিজের দেশের উন্নতি ও নিজের জাতির কল্যাণ চিন্তা করলেই চলবে না; আমাদেরকে


www.amarboi.org

সারা বিশ্ব ও মানবজাতির কল্যাণ চিন্তা করতে হবে। এ চিন্তার স্বাভাবিক দাবিই হলো মানবজাতির উপযোগী একই জীবনবিধান। একই জীবনবিধান যদি সকল মানুষের জন্য রচনা করা যায়, তবেই বিশ্বে মানবজাতির ঐক্য সম্ভব।

এরপর আমার মনে প্রশ্ন জাগল যে, বিশ্বস্রষ্টা মানুষের জন্যই পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করলেন, মানুষকে নৈতিক চেতনা দান করলেন, সৃষ্টিজগৎকে ব্যবহার করার ক্ষমতা দিলেন এবং এ ক্ষমতা প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে দেহযন্ত্র দান করলেন। তিনি কি এত সব শক্তি কীভাবে প্রয়োগ করা হবে, সে বিষয়ে কোনো বিধান দেননি?

কোথায় পাব এ প্রশ্নের জবাব? কে দিতে পারে সঠিক জবাব? ভাবলাম, বিশ্বব্যাপী পরিচিত যেসব ধর্ম রয়েছে, সবই তো স্রষ্টাকে স্বীকার করে। ধর্মগ্রন্থগুলোকে স্রষ্টার বাণী বলে বিশ্বাস করা হয়। স্রষ্টা কি মানুষকে শুধু ধর্মীয় জীবনের বিধানই দিয়েছেন? রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধ-সন্ধি, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে কি স্রষ্টা কোনো বিধান দেননি?

ছাত্রজীবনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নকালে জানলাম, খ্রিস্ট ধর্মযাজকগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী গির্জা থেকে রাষ্ট্র শাসন করতেন। হোলি রোমান এম্পায়ার ধর্মভিত্তিক বিরাট সাম্রাজ্য ছিল। ১৬ ও ১৭ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের আবিষ্কার আকাশমণ্ডলীর নব নব এমন সব তথ্য পেশ করল, যা ধর্মযাজকদের বিশ্বাসের বিরোধী হওয়ায় তারা রাষ্ট্রক্ষমতাবলে বিজ্ঞানীদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে লাগলেন। ইউরোপে রেনেসাঁর সূচনালগ্নে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এমন সব মতবাদ শিক্ষিত ও সচেতন মহলে প্রভাব বিস্তার করল, যার ফলে চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি হলো। প্রায় দু শ' বছর গির্জার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে আপস-মীমাংসা হলো যে, গির্জার কর্মক্ষেত্র শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় গির্জার কোনো ক্ষমতা থাকবে না। রাষ্ট্র সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে।

বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যার মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি বলে দাবি করা হয় এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রায় সব রাষ্ট্র এবং আফ্রিকা মহাদেশেরও বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা শাসিত। এসব রাষ্ট্রে ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়া পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে Divine Guidance বা স্রষ্টার বিধানের সামান্য প্রয়োজনও বোধ করা হয় না। তাদের ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেল' এসব ক্ষেত্রের জন্য কোনো বিধান দিয়েছে বলে তাদের ধর্মনেতারা দাবি করেন না।


www.amarboi.org

আমাদের প্রতিবেশী বিশাল ভারত রাষ্ট্রও ধর্মনিরপেক্ষ। তাদের ধর্মগ্রন্থ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য বিধান দিয়েছে বলে রাষ্ট্রপরিচালকগণ দাবি করেন না।

আমি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি ইসলামকে একটি ধর্ম হিসেবেই জানতাম। মুসলিম ধর্মনেতাগণ ইসলামকে মানবজীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে দাবি করেন বলে শুনিনি। আমি অনেক ধর্মসভায় তাদের বক্তব্য শুনেছি। তাতে ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম হিসেবেই জানতে পেরেছি।

১৯৫২ সাল পর্যন্ত আমার এ ধারণাই ছিল যে, স্রষ্টা মানুষকে ধর্মীয় বিধানই শুধু দিয়েছেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য বিধান দিয়েছেন বলে জানতে পারিনি।

## হঠাৎ শুনলাম ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনবিধান

১৯৪৮ সালে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ ক্লাসের ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদ (ডাকসু)-এর জেনারেল সেক্রেটারি, তখন 'তমদ্দুন মজলিস' নামক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেয়। ১৯৪৭ সালের আগস্টে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অধিক। তাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়াই গণতন্ত্রের দাবি।

স্বাধীন দেশে জনগণের মাতৃভাষাই রাষ্ট্রভাষা হয়ে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের কারো মাতৃভাষা উর্দু না হলেও সবাই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিলে আমাদের আপত্তি নেই। তাহলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা দুটো হোক– বাংলা ও উর্দু। তমদ্দুন মজলিস এ দাবিই জানাল।

স্বাভাবিক কারণেই আমি ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা'র দাবিতে হরতালে সক্রিয় ভূমিকা পালন করি। ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে ডাকসু'র পক্ষ থেকে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম গ্রাউন্ডে ভাইস চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশাল ছাত্রসমাবেশে আমি রাষ্ট্রভাষা বাংলাসহ পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় দাবি নিয়ে এক মেমোরেন্ডাম পেশ করি। তমদ্দুন মজলিসকে আমি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসেবেই তখন জানতাম।

১৯৫০ সালে আমি রংপুর কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে রংপুরে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে গ্রেফতার হয়ে রংপুর জেলে এক মাস আটক থাকলাম। ঐ বছরই জুলাই মাসে চট্টগ্রামের এক উচ্চ শিক্ষিত যুবক (চট্টগ্রামের সোলাইমান খান) কারমাইকেল


www.amarboi.org

কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত আমার বাসায় হাজির হয়ে তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে এসেছেন বলে পরিচয় দিলেন। ভাষা আন্দোলনের সুবাদে তমদ্দুন মজলিসের প্রতিনিধিকে স্বাগত জানালাম। দু দিনে তিনি আমার সাথে কয়েক বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে এমন এক দাবি উত্থাপন করলেন, যা আমার নিকট একেবারেই নতুন। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে, ইসলাম শুধু ধর্মই নয়, পরিপূর্ণ একটি জীবনবিধান এবং কুরআন এ বিষয়ে আল্লাহর বাণী। কুরআনে মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান দেওয়া হয়েছে।

তাঁর আকর্ষণীয় ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় প্রভাবিত হয়ে আমি তমদ্দুন মজলিসে যোগদান করলাম। কুরআন অধ্যয়নের সিদ্ধান্ত নিলাম। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা অধ্যয়নের চেষ্টা করলাম। ইতোমধ্যে তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমেই সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রচিত ছোট ছোট কয়েকটি ইংরেজি ও বাংলা বই পেলাম। অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে এ লেখকের আরো বই তালাশ করলাম। অনুভব করলাম যে, কুরআনকে সরাসরি অধ্যয়নের যোগ্যতা আমার নেই। এসব বই থেকেই সঠিক জ্ঞান লাভ করা সহজ। এ লেখকের নাম এর আগে আমি জানতাম না।

## কুরআন অধ্যয়নের নবপ্রেরণা পেলাম

এক জরুরি কাজে ১৯৫৪ সালের মার্চে রংপুর থেকে গাইবান্ধা গেলাম। ঘটনাক্রমে আমার জেলার একজনের সাথে পরিচয় হয়ে গেল। নাম জনাব আবদুল খালেক। বিখ্যাত রেলওয়ে জংশন আখাউড়ায় তার বাড়ি। আমাকে ধরে তিনি তাঁর অফিসে নিয়ে গেলেন। জানালেন, তিনি 'জামায়াতে ইসলামী' নামক একটি ইসলামী সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে কর্মরত আছেন। আমি এ সংগঠনের নাম এর আগে আর শুনিনি। তিনি আমাকে উর্দু ভাষায় লেখা কয়েকটি বই দিলেন। তখন আমি উর্দু ভাষা কোনো রকমে পড়তে পারি। লেখকের নাম দেখে খুব আকৃষ্ট হলাম। কারণ, মওদূদী সাহেবের কয়েকটি বই আগে পড়েছি। বইগুলো পড়ে আরো আকৃষ্ট হলাম। পাশের বাসায় উর্দু ও ফার্সি ভাষার অধ্যাপক সৈয়দ মুহাম্মদ ইসহাককে বইগুলো দিলাম। তিনি তো বইগুলো পড়ে এ লেখকের আরো বই জোগাড় করার জন্য রীতিমতো পীড়াপীড়ি শুরু করলেন।

দু সপ্তাহ পর গাইবান্ধা থেকে আবদুল খালেক সাহেবের চিঠি পেলাম। জানলাম, গাইবান্ধায় জামায়াতে ইসলামীর এক সম্মেলন হবে; সেখানে ঢাকা থেকে নেতৃবৃন্দ আসবেন। আমাকে এতে যোগদান করার অনুরোধ করেই চিঠিটি লিখেছেন।


www.amarboi.org

সম্মেলনে আগত জামায়াত নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় মুগ্ধ হলাম। সম্মেলন শেষে অতিথিগণের সাথে আমি আলোচনার সুযোগ পেলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের উর্দুভাষী শিক্ষক মুহাম্মদ ওয়ায়েরের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর রাত ১২টায় ঘুমাতে গেলাম। সারা রাত ঘুম হলো না। তমদ্দুন মজলিসে আছি, জামায়াতে ইসলামীতে যাব কি না, সে হিসাব-নিকাশেই রাত কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

রংপুরে সংগঠনের দুটো ইউনিট গঠিত হলো– একটি কলেজের পাঁচ জন অধ্যাপককে নিয়ে, অপরটি শহরে। গাইবান্ধা থেকে নতুন সংগঠনকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জনাব আবদুল খালেক প্রতি সপ্তাহে একদিন আসতে থাকলেন। সাংগঠনিক বিশেষ পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে তিনি ঘণ্টাখানেক কুরআন অধ্যয়নপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিন দিন আলোচনা শোনার পর আমি বিস্মিত ও বিমোহিত হয়ে বললাম, 'কুরআন অধ্যয়ন আমার অসাধ্য মনে করেছিলাম। আপনি কোথা থেকে এমন সহজ পদ্ধতির শিক্ষা পেলেন?' তিনি মওদূদী সাহেবের রচিত কুরআনের ব্যাখ্যা 'তাফহীমুল কুরআন' থেকে শিখেছেন বলে জানালেন।

এ ব্যাখ্যা অধ্যয়নের জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। তখনো বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ হয়নি। কলেজের উর্দু ভাষার অধ্যাপকের সাহায্য নিয়ে উর্দু ভাষায়ই অধ্যয়ন শুরু করলাম। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে(!) আবার রংপুর জেলে দু মাস আবদ্ধ থাকলাম। এ দু মাস অবিরাম কুরআন অধ্যয়নে নিয়োজিত রইলাম। আমার জ্ঞানের রাজ্যে মহাবিপ্লব ঘটে গেল।

## কুরআন অধ্যয়ন করে কী পেলাম?

'তাফহীম' শব্দের অর্থ বোঝা বা Understanding. তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন করে যা অবগত হলাম :

১. স্রষ্টা মানুষকে বিশ্বজগৎ ব্যবহার করার যে ক্ষমতা দিয়েছেন এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য হাতিয়ার হিসেবে যে দেহযন্ত্র দান করেছেন, তা সঠিকভাবে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় জ্ঞান কুরআনে রয়েছে। মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্যই তিনি পরিপূর্ণ বিধান এতে দান করেছেন। এ কুরআনই স্রষ্টার বাণীসম্বলিত সর্বশেষ গ্রন্থ।

২. বিধান দান করার জন্য তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা নিম্নরূপ :

মানুষের মধ্য থেকেই তিনি তাঁর বাণীবাহক নিযুক্ত করেন। যাকে তিনি বাণীবাহক নিয়োগ করেন তাঁর উপর দুটো দায়িত্ব দেন। প্রথমত,


www.amarboi.org

বাণীবাহকের মাতৃভাষায় তাঁর বাণী পাঠান। জিবরাঈল নামক এক ফেরেশতা বা Angel বা দেবদূত মানুষের আকারে বাণীবাহকের নিকট স্রষ্টার বাণী উচ্চারণ করে শোনান। বাণীবাহক তা মুখস্থ করেন এবং অন্যদেরকে উচ্চারণ করে শুনিয়ে দেন। এ বাণীবাহকের নিজের মনগড়া কোনো কথা শেখানোর অধিকার নেই। স্রষ্টার বাণীর ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব সরকারিভাবে বাণীবাহকের উপরই ন্যস্ত। এ ব্যাখ্যাও স্বয়ং স্রষ্টা তাঁর বাণীবাহককে শিখিয়ে দেন। স্রষ্টার বাণীর যে ব্যাখ্যা বাণীবাহকের অন্তরে দান করা হয় তা বাণীবাহক নিজের ভাষায় প্রকাশ করেন।

বাণীবাহকের দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো, স্রষ্টার বাণীতে যেসব বিধান দেওয়া হয়েছে তা নিজে বাস্তবে পালন করবেন এবং অন্যদেরকে পালন করা শিক্ষা দেবেন।

৩. বাণীবাহক হিসেবে স্রষ্টা যাকে নিয়োগ করেন, তিনি অন্যসব মানুষের মতোই একজন মানুষ। বাণীবাহক অতিমানব নন। অন্যান্য মানুষের মতো বাণীবাহককেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোক, আপদ-বিপদ ভোগ করতে হয়। সাধারণ মানুষকে যেমন জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় এবং বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, বাণীবাহককেও এসব যাতনা সইতে হয়। বাণীবাহককে যদি এসব ঝামেলা থেকে রেহাই দেওয়া হতো, তাহলে সাধারণ মানুষ স্রষ্টার বিধান পালন না করার অজুহাত পেয়ে যেত। বাণীবাহক যদি পালন করতে পারেন তাহলে তাঁরই মতো অন্যান্য মানুষ কেন পারবে না?

৪. স্রষ্টা এক জোড়া মানুষ প্রথম সৃষ্টি করে তাঁদের থেকেই সারা বিশ্বে মানবজাতিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বর্ণ ও চেহারার আকার এবং ভাষায় মানুষে মানুষে যত পার্থক্যই থাকুক মানবজাতির আদি বংশ একই। তাদের প্রকৃতিও একই। সকল মানুষেরই আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া।

৫. পৃথিবীতে মানুষ যাতে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পায় এবং জীবনের সকল দিকে সঠিক পথে চলতে পারে, সে উদ্দেশ্যে প্রথম মানুষটিকেই তিনি বাণীবাহক হিসেবে পাঠিয়েছেন।

৬. বাণীবাহক দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর ক্রমে ক্রমে পরবর্তী লোকেরা স্রষ্টার বাণীকে হারিয়ে বা বিকৃত করে মানবসমাজে অশান্তি সৃষ্টি করার পর যথাসময়ে আবার কোনো বাণীবাহক নিয়োগ করেছেন। এভাবেই যুগে যুগে বিভিন্ন জনপদে বাণীবাহক পাঠানো হয়েছে।

৭. পৃথিবীতে মানবজাতির সম্প্রসারণের এক পর্যায়ে এবং মানবসমাজের বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে ঐতিহাসিক যুগে মক্কা নগরীতে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত কুরাইশ বংশে 'মুহাম্মদ' নামে যিনি জন্মগ্রহণ করেন, স্রষ্টা তাঁকেই সর্বশেষ বাণীবাহক নিয়োগ করেন।


www.amarboi.org

৮. এর চার হাজার বছর পূর্বে ইরাকে 'ইবরাহীম' নামে যাকে বাণীবাহক নিয়োগ করা হয় তাঁকে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম জাতি স্রষ্টার বাণীবাহক হিসেবে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। তাঁরই বংশে মূসা ও ঈসা (যীশুখৃষ্ট) জন্মগ্রহণ করেন। মূসাকে ইহুদিরা এবং ঈসাকে খ্রিস্টানরা স্রষ্টার বাণীবাহক হিসেবে বিশ্বাস করেন। যারা মুসলিম বলে দাবি করে, কুরআন তাদেরকে ঐ তিন জনকেও স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত বাণীবাহক হিসেবে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে।

৯. 'প্রত্যেক জনপদেই বাণীবাহক পাঠানো হয়েছে'— কুরআনের এ বাণীর ব্যাখ্যায় মওদূদী সাহেব লিখেছেন :

'ভারত বিশ্বের প্রাচীনতম জনপদের একটি। কুরআনের দাবি অনুযায়ী অবশ্যই ভারতে বাণীবাহক নিয়োগ করা হয়েছে। কুরআনে মাত্র ২৫ জন বাণীবাহকের নাম রয়েছে। কুরআনে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহু বাণীবাহকের নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তাই শ্রীকৃষ্ণের মতো মহান ব্যক্তি হয়তো বাণীবাহক ছিলেন। এ নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি বলে নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই যে, তিনি বাণীবাহক ছিলেন। কিন্তু এ কথা বলাও মোটেই উচিত নয় যে, তিনি বাণীবাহক ছিলেন না। হয়তো ছিলেন।'

১০. যে যুগে আরবে মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগে পৃথিবীতে একদিকে রোম সাম্রাজ্য ও অপরদিকে পারস্য সাম্রাজ্যের দাপট ছিল। সে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার যেটুকু বিকাশ ঘটেছিল, তার কিছুই আরবে পৌঁছেনি। অল্প কিছু লোক ছাড়া জনগণ সম্পূর্ণ অশিক্ষিত ছিল। জনগণ গোত্রে গোত্রে বিভক্ত ছিল। বেশির ভাগ মানুষই মরুচারী বেদুইন ছিল। উট, মেষ, দুম্বা, ছাগল ইত্যাদি পশু ও খেজুরই তাদের জীবিকার একমাত্র উৎস ছিল। শহরবাসীরা ব্যবসায়ী ছিল। গোত্রে গোত্রে পুরুষানুক্রমে লড়াই চলত। মারামারি, কাটাকাটি, রাহাজানি, লুটতরাজ তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এ কারণে সে সময়ের সভ্যজগৎ আরবজাতিকে 'বর্বর ও অসভ্য' বলে মনে করত।

মুহাম্মদ ৪০ বছর বয়সে স্রষ্টার বাণীবাহক হওয়ার পর মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে কুরআনের বিধান প্রয়োগ করে ঐ অসভ্য জাতিকে মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসেবে গড়ে তোলেন, যেন এক অলৌকিক জাদুর স্পর্শে বর্বর মানুষগুলো নৈতিক মানের দিক দিয়ে উন্নততম চরিত্রের অধিকারী হয়ে গেল। এ উন্নতি কয়েক প্রজন্মে ঘটেনি। একই প্রজন্ম মাত্র দু দশকে এভাবে বদলে গেল।


www.amarboi.org

এখন যেমন ইরাক থেকে পশ্চিম আফ্রিকার আলজেরিয়া পর্যন্ত বিশাল আরব বিশ্ব রয়েছে, তখন আরব বলতে শুধু আরব বদ্বীপটি বোঝাত, যেখানে এখন কুয়েত, সৌদি আরব, ইয়ামেন, বাহরাইন ও আমিরাত অবস্থিত। জনসংখ্যা তখন মাত্র কয়েক লাখ। তারা এমন সুসংগঠিত শক্তিতে পরিণত হয় যে, রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র আরবসভ্যতার প্রভাব থেকে তাদের জনগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গায়েপড়ে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়; কিন্তু স্রষ্টার রচিত বিধান অনুযায়ী গড়েওঠা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে জয় করার বদলে নিজেরাই পরাজিত হয়। এটা স্বীকৃত ইতিহাস; প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী নয়। ঐতিহাসিক যুগের বাস্তব ঘটনা।

## কুরআন কি সত্যিই স্রষ্টার বাণী?

এ বিষয়ে মওদূদী সাহেব গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা নিম্নরূপ :

১. কুরআন নামে পরিচিত বিরাট গ্রন্থটি হঠাৎ একসাথে লিখিত আকারে অবতীর্ণ হয়নি। ২৩ বছরে কিছু কিছু করে বিবৃতি আকারে মুহাম্মদ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যা তিনি সংরক্ষিত করে রেখে গেছেন। তা ছাড়া তিনি ও তাঁর সাথীগণের অনেকে গোটা কুরআনকে কণ্ঠস্থ করেছেন।

২. মুহাম্মদ-এর কণ্ঠে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চমৎকার ভাষা শুনে লোকেরা মন্তব্য করল যে, এর আগে কোনো সময় তাঁর মুখে এমন ধরনের কথা শোনা যায়নি। মানুষ বিস্মিত হলো যে, ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত যে ভাষায় তিনি কথা বলেছেন, তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এত উন্নততর ভাষা হঠাৎ করে কোথায় পেলেন!

৩. কুরআনের ভাষা, শব্দ চয়ন, এর ছন্দশৈলী ও আকর্ষণীয় ভাবধারা এমন বিস্ময়কর যে, আজ পর্যন্ত এ মানের কোনো সাহিত্য কোনো মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। মুহাম্মদ মানুষের নিকট এ বাণীকে ঐশী বলে দাবি করলে কতক লোক তা মুহাম্মদের রচনা বা অন্য কোনো লোকের রচনা বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। কুরআন চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে যে, যদি তা-ই মনে করা হয় তাহলে অনুরূপ রচনা করে কেউ দেখাক। এ চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করতে সাহস করেনি।

৪. কুরআনের বাণী মুহাম্মদের যে মুখে ২৩ বছর মানুষকে শোনানো হয়েছে, ঐ মুখে তিনি ২৩ বছর আরো অনেক কথা বলেছেন, যা কুরআনের চেয়ে অনেক বড় বড় কয়েকটি গ্রন্থে সংকলিত। তাঁর লাখ লাখ বচন তাঁর সাথীগণ বর্ণনা করেছেন, যা ধারাবাহিকভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিক্ষণীয় হিসেবে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। এসবকে 'হাদীস' নামে অভিহিত করা হয়। হাদীস শব্দের অর্থ 'কথা'।


www.amarboi.org

এটা কি বাস্তবে কখনো সম্ভব যে, একই ব্যক্তি দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে একই ভাষায় সম্পূর্ণ ভিন্ন মানের দু রকম কথা বলেছেন? আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ যে কেউ কুরআন ও হাদীসের ভাষার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তা সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম। সম্পূর্ণ দু মানের এক ভাষা একই মুখ থেকে মানুষ শুনেছে একটানা ২৩ বছর! কোন্‌টা স্রষ্টার ভাষা, আর কোন্‌টা মুহাম্মদের ভাষা তা শ্রোতারা সহজেই চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ, স্রষ্টা আর তাঁর বাণীবাহকের ভাষার মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে।

৫. সকল ভাষায়ই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। মাত্র দু শ' বছর আগের বাংলা পদ্য ও গদ্য এখন দুর্বোধ্য। আধুনিক বাংলায় অনুবাদ করে তা বুঝতে হয়। আরবী ভাষাও আধুনিক যুগে কুরআনের ভাষা থেকে অনেক ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও দেড় হাজার বছরের প্রাচীন কুরআনের ভাষা আরবী জানা আধুনিক লোকও বিনা অনুবাদেই বোঝে। স্রষ্টার বাণী বলেই কুরআনের ভাষার এ অলৌকিক বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন এমন এক শাশ্বত মানের ভাষা, যা আরবী ভাষাকে এমন পরিবর্তন হতে দেয়নি, যার ফলে আধুনিক আরবীভাষীদের নিকট কুরআন দুর্বোধ্য হয়ে যেতে পারে। স্রষ্টার রচিত বলেই কুরআনের ভাষা চির আধুনিক।

৬. কুরআন স্রষ্টার রচিত বলেই ৭৭,৪৩৬ শব্দের এই বিশাল গ্রন্থটি কোটি কোটি মানুষ নির্ভুলভাবে মুখস্থ করে রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশেও কয়েক লাখ লোক রয়েছেন, যাঁরা সম্পূর্ণ গ্রন্থটি মুখস্থ করেছেন এবং রোযার মাসে নামাযে পড়ে শোনাচ্ছেন।

যে ভাষার অর্থ জানা নেই, এমন ভাষায় লিখিত কত পৃষ্ঠা মুখস্থ করা সম্ভব? বাংলাদেশেই সর্বত্র এমন বহু মক্তব-মাদরাসা রয়েছে, যেখানে ৫ থেকে ৭ বছরের শিশুরা ২ বা ৩ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করছে। অথচ তারা আরবী ভাষার অর্থ বোঝা তো দূরের কথা, নিজের মাতৃভাষাও পড়তে শেখেনি। কুরআন মুখস্থ করা শেষ হওয়ার পর তারা মাতৃভাষা ও পরবর্তী শিক্ষা লাভ করে।

৭. কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যার মাধ্যমে স্রষ্টা মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় মূল বিধান দান করেছেন। মানুষকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, তারা প্রয়োজনমতো বিস্তারিত বিধি-বিধান রচনা করে নেবে; কিন্তু উক্ত মৌল বিধানের বিরোধী কোনো বিধান যেন তৈরি করা না হয়। মানবজাতির জন্য বিধানদাতা একমাত্র স্রষ্টা। শুধু তাঁর রচিত বিধানই


www.amarboi.org

নিশ্চিতভাবে নির্ভুল। এসব বিধান সর্বকালে, সকল দেশে ও সকল মানুষের জন্যই উপযোগী। এই মৌলিক বিধানে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন নেই।

৮. পূর্ববর্তী বাণীবাহকগণের নিকট প্রেরিত বাণীসমূহ বিকৃত হওয়ার কারণেই বারবার নতুন করে বাণী পাঠাতে হয়েছে। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, স্রষ্টা স্বয়ং কুরআনকে বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। বিশ্বের সকল ধর্মগ্রন্থ যদি ধ্বংস করেও দেওয়া হয়, তাহলে একমাত্র কুরআনকেই পুনরায় গ্রন্থাকারে প্রস্তুত করা সম্ভব। কারণ, কোটি কোটি মানুষ কুরআনকে তাদের স্মৃতিশক্তিতে ধরে রেখেছেন। আর কোনো গ্রন্থ এভাবে স্মৃতিতে ধারণ করা হয় না।

## মানবজাতির প্রতি কুরআনের আহ্বান

মানবজাতিকে সম্বোধন করে কথা বলার পজিশন স্রষ্টা ছাড়া আর কার আছে? আর কার কথা নিশ্চিতভাবে নির্ভুল হতে পারে? কুরআনের মতে, মানুষ স্রষ্টার অতি প্রিয় সৃষ্টি। বিশ্বে স্রষ্টা একমাত্র মানুষকেই তাঁর প্রতিনিধির মর্যাদা দান করেছেন। এ অর্থে মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধি। মানুষের জন্য তিনি যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন তা তাঁরই পক্ষ থেকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্বও মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। অন্য সকল সৃষ্টির জন্য তাঁর রচিত বিধান তিনি স্বয়ং চালু করেন। মানবদেহের জন্য তিনি যে বিধি-বিধান তৈরি করেছেন তা-ও তিনি নিজেই জারি করেন। কিন্তু নৈতিক জীব হিসেবে যে সত্তাকে মানুষ নামে সৃষ্টি করেছেন, তাদের জন্য রচিত বিধান তিনি নিজে বাস্তবায়ন করেন না। তাঁর পক্ষ থেকে সে বিধান বিশ্বে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব মানুষকেই দেওয়া হয়েছে।

মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা তাঁর বিধানকে কোনো বাণীবাহকের মাধ্যমে পাঠাননি। তিনি স্বয়ং তা চালু করেছেন। একমাত্র মানুষের জন্য রচিত বিধানই তিনি বাণীবাহকের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাণীবাহক ও তাঁর অনুসারীদের উপর ন্যস্ত করেন।

মানবজাতিকে সম্বোধন করে বিশ্বস্রষ্টা অতি দরদের ভাষায় যে আহ্বান জানিয়েছেন, এর সারসংক্ষেপ এখানে পরিবেশন করছি– যাতে পাঠক-পাঠিকাগণ মোটামুটি ধারণা পেতে পারেন। বিশ্বপতির বক্তব্যের সারকথা জানার পর যারা মূল বক্তব্য সরাসরি স্রষ্টার ভাষায় জানতে চান, তারা 'তরজমায়ে কুরআন মজীদ' নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ অধ্যয়ন করতে পারেন। মওদূদী সাহেব অতি সংক্ষিপ্ত টীকাসহকারে এ গ্রন্থে উর্দু ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেছেন। আমি বাংলায় অনুবাদ করেছি, যা তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এর নাম রেখেছি 'সহজ


www.amarboi.org

বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ'। আরো বিস্তারিত জানতে হলে তাঁরই রচিত 'তাফহীমুল কুরআন'-এর বাংলা অনুবাদ পড়ুন। এ দীর্ঘ ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাংলা ভাষায় ১৯ খণ্ডে প্রকাশিত।

## স্রষ্টার আহ্বানের সারকথা

১. হে মানুষ! তোমাদেরকে আমিই সৃষ্টি করেছি এবং সৃষ্টিজগতে তোমরাই শ্রেষ্ঠ।

২. হে মানুষ! তোমাদের সেবার জন্যই মহাবিশ্বের সব কিছু আমি তৈরি করেছি। আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি তোমাদেরই সেবায় নিযুক্ত। এরা কেউ তোমাদের পূজা-উপাসনা পাওয়ার যোগ্য নয়। আমি ছাড়া তোমাদের চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তাই তোমরা সবাই শুধু আমার হুকুমমতো চলো।

৩. অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে সূর্যের মতো মহাসৃষ্টি পর্যন্ত যাকিছু আমি সৃষ্টি করেছি, এরা সবাই আমার রচিত নিয়ম-কানুন মেনে চলছে। এরা কেউ স্বাধীন নয়। যার জন্য যে বিধান আমি তৈরি করেছি, সে বিধান তার উপর নিজেই চালু করে দিয়েছি। এ নিয়মের বিপরীত চলার ক্ষমতা কারো নেই।

৪. হে মানুষ! তোমাদের দেহের প্রতিটি অংশের জন্য আমি বিধান তৈরি করে তা চালু করে দিয়েছি। তোমাদের রক্ত চলাচলের নিয়ম, শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম, খাদ্য হজম হওয়ার নিয়ম, কথা বলা ও শোনার নিয়ম ইত্যাদি সবই আমার তৈরি। এর ব্যতিক্রম চলার কোনো ক্ষমতা তোমাদের নেই।

৫. স্রষ্টা হিসেবে আমি সৃষ্টির জন্য যে বিধান দিয়েছি, তা-ই ঐ সৃষ্টির 'ইসলাম'। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, গাছপালা, নদী-নালা, আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সবই আমার বিধান মেনে চলছে। অর্থাৎ, তারা তাদের 'ইসলাম' পালন করে আত্মসমর্পণের প্রমাণ দিয়েছে। তাই এরা শান্তিতে আছে। 'ইসলাম' শব্দের আরেক অর্থ হলো 'শান্তি'। সৃষ্টিজগৎ স্রষ্টার বিধানের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেই শান্তি ভোগ করছে।

৬. হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সমস্ত সৃষ্টির সেরা হিসেবে এক পৃথক মর্যাদা দিয়েছি। তোমাদের জড়দেহটা আসল মানুষ নয়। রূহ বা আত্মাই হলো প্রকৃত মানুষ। ভালো ও মন্দ সম্পর্কে যে চেতনা, তা-ই হলো মানুষ। এরই অপর নাম বিবেক। আমি অন্য কোনো জীবকেই এ বিবেকশক্তি দিইনি। এ বিবেকের কারণেই তোমরা সেরা জীব।


www.amarboi.org

৭. হে মানুষ! তোমাদেরকে আমি দুটো জিনিস দিয়েছি– একটি হলো বিশ্বজগৎ, আরেকটি হলো এ জড়জগৎকে ব্যবহার করার উপযোগী একটি হাতিয়ার। মানবদেহ হলো ঐ হাতিয়ার। দেহরূপ যন্ত্রের সাহায্যে সকল সৃষ্টিকে ব্যবহার করার এ অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র তোমাদেরকেই দিয়েছি। সৃষ্টিজগতে এ অধিকার ও ক্ষমতা অন্য কারো নেই।

৮. হে মানুষ! তোমরা যদি বিবেক দ্বারা চালিত হও, তাহলে কেউ তোমাদেরকে ভুল পথে নিতে পারবে না; কিন্তু যদি বিবেককে দাবিয়ে রেখে দেহের দাবি মেনে চল, তাহলে সৃষ্টিজগতের সেবা থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে। যে জড়জগৎ তোমাদের কল্যাণের জন্য তৈরি করেছি তা একমাত্র তখনই কল্যাণ দেবে, যখন তোমরা দেহের দাবিকে বিবেকের অধীনে রাখবে। এতে যদি তোমরা ব্যর্থ হও, তাহলে সমস্ত জড়শক্তি অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং এ করুণ পরিণতির জন্য তোমরাই দায়ী হবে। তোমাদের হাতেই তোমরা ধ্বংস হবে।

৯. হে মানুষ! তোমরা যাতে বিবেককে শক্তিশালী করে দেহের প্রবৃত্তি ও দাবিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার যোগ্যতা লাভ করতে পার এবং গোটা জড়জগতের সেবা ভোগ করতে পার, সে উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে আমি মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় বিধান পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক যুগেই আমি এ উদ্দেশ্যে আদর্শ মানুষ পাঠিয়েছি। তাঁরা আমার ঐসব বিধানকে পালন করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমার বিধান কীভাবে মানবসমাজকে সুখী ও শান্তিপূর্ণ বানাতে পারে। তাদেরকেই আরবীতে 'রাসূল' বা 'নবী' বলা হয়। এর অর্থ হলো বাণীবাহক। নবী ও রাসূলগণ আমার প্রেরিত বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

১০. মানুষ ব্যতীত অন্যসব সৃষ্টির জন্য এক রকম ইসলাম আর মানুষের জন্য অন্য রকম ইসলাম দিয়েছি। এক রকম ইসলাম সৃষ্টির জন্য বাধ্যতামূলক। আমি নিজেই তা তাদের উপর কার্যকর করি। যেমন– মানবদেহ ও গোটা বিশ্বজগৎ। আরেক রকম ইসলাম হলো বিবেকসম্পন্ন মানুষের জন্য। আমি এ বিধান রচনা করলেও মানুষের উপর তা জোর করে চালু করিনি। মানুষকে এ বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি। যার ইচ্ছা এ বিধান মেনে চলতে পারে, আর যার ইচ্ছা সে না-ও মানতে পারে। আমি মানুষকে মানতে বাধ্য করি না।

প্রথম ধরনের ইসলাম সকল সৃষ্টিই বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে এবং সে বিধান অমান্য করার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। তাই চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা


www.amarboi.org

ইত্যাদি যাবতীয় সৃষ্টি স্রষ্টার বিধান পালন করলেও এর জন্য তারা কোনো পুরস্কার পাবে না। কারণ, এ বিধান পালনের মধ্যে তাদের কোনো কৃতিত্ব নেই। আর তাদের এ বিধান অমান্য করার কোনো ক্ষমতা নেই বলে তাদের কোনো রকম শাস্তি পাওয়ারও কারণ নেই।

হে মানুষ! পুরস্কার ও তিরস্কার শুধু তোমাদের জন্য। কারণ, তোমাদের জন্য যে বিধান দেওয়া হয়েছে, তা মানা ও না মানার ক্ষমতা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তাই যারা নিজের ইচ্ছায় তা মেনে চলে, তাদের কৃতিত্বের জন্যই তারা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কারণ, অমান্য করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা মান্য করেছে। তেমনি মান্য করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যারা অমান্য করে, তারা শাস্তিরই যোগ্য।

১১. সৃষ্টিজগতের জন্য আমি স্রষ্টা হিসেবে বাধ্যতামূলক যে ইসলাম দিয়েছি, তা পাঠানোর জন্য রাসূল ও নবীর দরকার হয়নি। আমি নিজেই সে বিধান চালু করি; কিন্তু আমি মানুষের জন্য যে বিধান রচনা করেছি, তা রাসূলের মাধ্যমেই পাঠিয়েছি। আমার পক্ষ থেকে আমার প্রতিনিধি হিসেবে তারা এই বিধানকে মানবসমাজে চালু করেছেন। যারা রাসূল থেকে সে বিধান শিক্ষা করে এবং তা মেনে চলে, তাদেরকেও আমার প্রতিনিধির মর্যাদা দান করি।

১২. আমি সব যুগে সব দেশেই আমার রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের কাছে আমার রচিত বিধান পাঠিয়েছি। যখনই মানুষ পরবর্তীকালে ঐ বিধানকে বিকৃত করে ফেলেছে, তখনই আবার আমি নতুন রাসূল পাঠিয়ে তার কাছে আবার বিশুদ্ধ বিধান পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার সর্বশেষ রাসূল হলেন মক্কার কুরাইশ বংশের আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তাঁর কাছে পাঠানো আমার বিধানের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ রূপই হলো আল কুরআন।

১৩. যেহেতু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মুহাম্মদই শেষ রাসূল এবং কুরআনই চূড়ান্ত বিধান, সেহেতু আমি এই কুরআনকে বিকৃত হতে দেব না। মুহাম্মদের কাছে ৬১০ সাল থেকে ৬৩৩ সাল পর্যন্ত ২৩ বছরে এই কুরআন যে ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, হুবহু সে ভাষায়ই যাতে এ কুরআন মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে, সে ব্যবস্থা আমিই করেছি।

১৪. এ কুরআনের সঠিক অর্থ বোঝানোর দায়িত্ব আমি মুহাম্মদকেই দিয়েছি। তিনি মানবসমাজে কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবে চালু করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আমার বিধান মেনে চলার জন্য যেসব লোক মুহাম্মদের সাথী হয়েছিলেন, তারা মুহাম্মদ থেকেই সব কিছু শিখেছিলেন।


www.amarboi.org

আমার বিধান কীভাবে পালন করতে হবে, সে বিষয়ে আমি মুহাম্মদকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ আদর্শ নমুনা বানিয়েছি। তাঁকে তাঁর সাথীরা পূর্ণরূপে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন বলে আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি। সুতরাং যদি কেউ আমার কুরআনকে মেনে চলতে চায়, তাহলে তাকে মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীগণের জীবন থেকেই কুরআনকে বুঝতে হবে।

১৫. আমার রচিত বিধানের নাম রেখেছি 'ইসলাম' এবং যারা এ বিধান মেনে চলে তাদের নাম দিয়েছি 'মুসলিম'। ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ আর মুসলিম মানে যে আত্মসমর্পণ করল। আমি কাউকে বংশগত কারণে মুসলিম বলে স্বীকার করি না। এমনকি নবীর ছেলেও যদি আমার বিধান না মানে, তাহলে তাকে আমি বিদ্রোহী ঘোষণা করি। আমার নিকট সে ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে গণ্য, যে আমার কুরআনকে ঐভাবে মেনে চলার চেষ্টা করে, যেভাবে মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীগণ মেনে চলেছেন।

১৬. যেহেতু আমার কুরআনের বাস্তব নমুনা শুধু মুহাম্মদের মধ্যেই পূর্ণরূপে পাওয়া যায়, সেহেতু মানবজাতির পক্ষে সঠিক পথনির্দেশ পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের কোনো অংশ যাতে হারিয়ে না যায় তার ব্যবস্থাও করেছি। সুতরাং যারা ইসলামের সঠিক রূপ জানতে চায় এবং কুরআনের জীবন্ত নমুনা দেখতে চায়, তাদেরকে শেষ নবীর জীবনী ভালো করে জানতে হবে।

১৭. রাসূলের মাধ্যমে আমি যে বিধান মানবজাতির পার্থিব কল্যাণ ও শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির জন্য পাঠিয়েছি, সে বিধান যারা নিষ্ঠার সাথে মেনে চলে, তারাই আমার অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য। আর যারা আমার বিধানের ধারক ও বাহক হওয়ার দাবিদার হয়েও বাস্তবে সে বিধান মেনে চলে না, তারাই আমার অভিশাপের উপযুক্ত।

আমার এ নীতি চিরন্তন। এ নীতির বাইরে আমি কোনো মানবগোষ্ঠীর সাথে কখনো ভিন্ন আচরণ করি না।

১৮. আমার প্রেরিত বিধানের সর্বশেষ রূপ হলো কুরআন। এ কুরআনের শিক্ষাকে মানবজাতির নিকট সঠিকরূপে পৌঁছানোর যোগ্যতা মুহাম্মদের সাথীরা অর্জন করেছিল বলেই আমি তাদেরকে মানবজাতির পথপ্রদর্শকের মর্যাদা দিয়েছিলাম। আমার ও মানবজাতির মাঝখানে তারাই মাধ্যমের ভূমিকা পালন করেছিল। আমি যা পছন্দ করি, তারা তা-ই মানবসমাজে চালু করেছিল এবং আমি যা অপছন্দ করি, তা সমাজ থেকে তারা উৎখাত করেছিল। যারা এ ভূমিকা পালন করে, তারাই হলো আমার অনুগত সেনাবাহিনী। যতদিন তারা এ দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে, ততদিনই


www.amarboi.org

আমি তাদের নেতৃত্ব ও প্রাধান্য বহাল রাখি এবং তখন তারা বিজয়ী শক্তি হিসেবে মানবজাতির নেতৃত্ব দান করে।

তাদের সংখ্যা যত কমই হোক এবং তাদের বিরোধী শক্তি যত বড়ই হোক, আমি তাদেরকে বিজয়ীর মর্যাদায়ই কায়েম রাখি। তাদের নৈতিক বল, চারিত্রিক প্রাধান্য ও মানবিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাদের চেয়ে বেশি জনবল ও বস্তুশক্তিসম্পন্ন মানবগোষ্ঠীর উপর তারা বিজয়ী হতে থাকে।

১৯. যে গুণাবলির দরুন আমি কোনো জাতিকে এ বিজয় ও প্রাধান্য দিয়ে থাকি, তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যদি ঐসব গুণাবলি লোপ পায়, তাহলে তারা আমার নিকট অভিশপ্ত হিসেবে গণ্য হয়। ফলে নেতৃত্বের মর্যাদা থেকে আমি তাদেরকে বঞ্চিত করি। তখন তারা জনবল ও বস্তুশক্তিতে যত বড়ই হোক, তারা আমার অনুগ্রহ পাওয়ার আর যোগ্য থাকে না। আমার অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে পৃথিবীতে তারা অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে আর পরকালেও শাস্তি ভোগ করবে। কারণ, তাদের কাছে আমার বাণী ও বিধান থাকা সত্ত্বেও তারা মানবজাতিকে তা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

২০. আমি মানুষকে ভালো ও মন্দের যে চেতনা দিয়ে সৃষ্টি করেছি, এরই ফলে তার প্রতিটি চিন্তা, কথা ও কাজকে ঐ চেতনা দিয়েই বিচার করব। বিবেকশক্তি প্রত্যেক মানুষকেই আমি দান করেছি। সে জেনে-শুনেই মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। চুরি করা, ঘুষ খাওয়া, মিথ্যা বলা, ডাকাতি করা, ব্যভিচার করা, হত্যা করা ইত্যাদি জঘন্য বলে জানা সত্ত্বেও মানুষ এসব অন্যায় কুকর্মে লিপ্ত হয়। সুতরাং সে যে অপরাধী, সে কথা তার বিবেকের নিকট অজানা নয়।

আমি তাকে এ চেতনা দান করেছি বলেই মৃত্যুর পর তার প্রতিটি বিবেকবিরোধী কাজের জন্য আমি তাকে শাস্তি দেব। অন্যান্য জীব-জন্তুকে আমি এ চেতনা দান করিনি। তাই তারা সহজাত প্রবৃত্তি থেকে যাকিছু করে, সে জন্য তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে না। এ বিবেকশক্তির কারণেই মানুষ সেরা সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে। অথচ এ বিবেকের বিরুদ্ধে চলার কারণেই মানুষ পশুর চেয়েও অধম বলে গণ্য হয়।

মানুষ যাতে তার যথার্থ মর্যাদা বজায় রেখে দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে মুক্তি পেতে পারে এবং নিজের প্রবৃত্তির তাড়নাকে পরাজিত করে বিবেকের কথামতো চলার যোগ্য হতে পারে, তারই পূর্ণাঙ্গ বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে কুরআনে দিয়েছি। মুহাম্মদ তাঁর জীবনে কুরআনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা অর্জন করতে হলে একমাত্র আদর্শ মানুষ মুহাম্মদ থেকেই তা শিখতে হবে।


www.amarboi.org

২১. যারা পরকালের মুক্তির জন্য বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন করে, তারা আমার দেওয়া পার্থিব দায়িত্ব থেকে পালিয়ে মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে। সংসারের বোঝা ফেলে দিয়ে এবং পার্থিব অগণিত দায়িত্বকে অবহেলা করে যারা ধার্মিক সেজে বেড়ায়, তারা মানবজাতির জন্য কোনো আদর্শ হতে পারে না। সব মানুষ তাদের এই ভ্রান্ত আদর্শ গ্রহণ করলে মানুষের স্বাভাবিক অস্তিত্বই শেষ হয়ে যাবে।

ভালো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য যারা সমাজ থেকে দূরে সরে থাকে, তারা মন্দকে জয় করে না। প্রকৃতপক্ষে মন্দের নিকট পরাজয় স্বীকার করেই তারা সংসারবিরাগী হয়। চরিত্র জঙ্গলে সৃষ্টি হয় না। সমাজে যারা বসবাস করে, তাদের মধ্যে সৎ ও অসৎ উভয় রকমের চরিত্রই পাওয়া যায়। যারা সমাজ ছেড়ে বনে-জঙ্গলে চলে যায়, তাদের চরিত্র সৎ বা অসৎ কোনোটাই নয়। সমাজে যে বাস করে, সে হয় সত্যবাদী আর না হয় মিথ্যাবাদী। কারণ, তাকে কথা বলতেই হয়। সত্য বলতে পারলে সত্যবাদী বলে সে গণ্য হয়। কিন্তু যে বন-জঙ্গলে গিয়ে বৈরাগ্য জীবনযাপন করে, সে তো সমাজেই থাকে না; তার তো কথা বলারই সুযোগ নেই। সুতরাং সে মিথ্যাবাদী না হলেও তাকে সত্যবাদী বলারও সুযোগ নেই।

সংসারের ঝামেলায় থেকে এবং মানবসমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে মন্দ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন বলেই তো এর জন্য আমি পুরস্কার দেব; কিন্তু পার্থিব দায়িত্ব থেকে যারা পালিয়ে আমার হুকুম অমান্য করে তাদেরকে এ অপরাধের দরুন শাস্তি দেব। কুরআনে মানুষকে সৎ ও যোগ্য সামাজিক জীব হওয়ার শিক্ষাই আমি দিয়েছি। ভালো মানুষ হওয়ার জন্য সংসার ত্যাগ করতে হবে না, আমার দেওয়া জীবনবিধান কুরআনকে মেনে চলতে হবে।

## কুরআন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পদ নয়

স্রষ্টার আহ্বানের উপরিউক্ত সারকথার ১৭, ১৮ ও ১৯ নম্বর বক্তব্য অনুযায়ী বাস্তবে লক্ষ করা যায় যে, মুসলিম জাতি হিসেবে যারা বর্তমানে পরিচিত তারা কুরআনের বাহক বলে দাবি করলেও স্রষ্টার দেওয়া দায়িত্ব পালন না করার ফলে সংখ্যায় অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বে তারা যথাযোগ্য মর্যাদা পাচ্ছে না। স্রষ্টা তাদেরকে স্রষ্টা ও মানবজাতির মধ্যবর্তী সম্প্রদায়ের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন। যে গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলে ঐ দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয় সেসব থেকে তারা বঞ্চিত।


www.amarboi.org

বিশ্বে ৫৫টিরও বেশি রাষ্ট্রে মুসলিম নামধারীরা সংখ্যাগুরু এবং শাসনক্ষমতাও তাদেরই হাতে; কিন্তু তারা দীর্ঘদিন থেকেই দুনিয়ায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত। অথচ মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারী সাথীগণ সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র স্রষ্টার প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের কারণেই মানবজাতিকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের উত্তরসূরিরা শত শত বছর বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ভারতবর্ষেও তারা শত শত বছর শাসক ছিলেন।

স্রষ্টার নিকট শুধু মুসলিম দাবি করার কোনো মূল্য নেই। প্রকৃত মুসলিমের গুণাবলি থেকে বঞ্চিত মুসলিম নামধারীদের প্রতি স্রষ্টার ক্ষুব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। স্রষ্টা কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না। তাঁর নীতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

মুসলিম দেশগুলোর নেতৃত্বে যারা আছেন, তারা মুসলিম নামধারী হলেও তারা কি মুহাম্মদকে আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করেন? তারা কয়জন কুরআন বোঝেন? তারা কি কুরআনের শিক্ষা মেনে চলেন, সমাজে চালু করেন? মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীগণ যেভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন তারা যদি তা-ই করতেন তাহলে অমুসলিম জাতি ও নেতৃবৃন্দ তাদের নিকট থেকে কুরআনের শিক্ষা লাভ করতে পারতেন। মানবজাতিকে কুরআনের আলোকে আলোকিত করার দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে তারা ইউরোপ ও আমেরিকার পথভ্রষ্ট শাসকদের অন্ধ অনুকরণ করে চলেন।

বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা ছয় শ' কোটিরও বেশি। এর মধ্যে মুসলিম জাতি দাবি করে যে, তারা দেড় শ' কোটি। বাকি সাড়ে চার শ' কোটির নিকট স্রষ্টার বাণী হিসেবে কুরআনকে পরিচিত করার দায়িত্ব মুসলিমদের। অমুসলিমরা কুরআনকে মুসলিম জাতির ধর্মগ্রন্থ বলেই মনে করে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এ ভুল ধারণার জন্য অবশ্যই মুসলিমরাই দায়ী।

স্রষ্টা যেমন নির্দিষ্ট কোনো এক সম্প্রদায়ের স্রষ্টা নন, তেমনি তাঁর বাণী কুরআনও কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্পদ নয়। বিশ্বে স্রষ্টার বাণীর চেয়ে বড় কোনো সম্পদ হতে পারে না। এ সম্পদই মানবজাতির একমাত্র ও নির্ভুল পথপ্রদর্শক। মানবজাতিকে সে পথ দেখানোর দায়িত্ব পালন না করায় মুসলিম জাতি স্রষ্টার দেওয়া শাস্তিস্বরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করছে।

ডাক্তারের সন্তান কি জন্মগতভাবে ডাক্তার বলে গণ্য হতে পারে? ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা না করে কেউ যেমন ডাক্তার হতে পারে না, শুধু মুসলিমের সন্তান হলেই কেউ স্রষ্টার নিকট মুসলিমের মর্যাদা পেতে পারে না।


www.amarboi.org

## মানবজাতি আজ স্রষ্টার প্রদর্শিত পথ থেকে বঞ্চিত

আমেরিকা ও ইউরোপ বর্তমান বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ Divine Guidance-এর কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। তারা বুদ্ধি, মেধা ও ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকেই যথেষ্ট মনে করেন। ফলে মানবজাতি স্রষ্টার পথনির্দেশ থেকে বঞ্চিত।

এ নেতৃত্ব মানবজাতিকে দুটো বিশ্বযুদ্ধ 'উপহার' দিয়েছে। ২১ শতকের শুরু থেকে তারা বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে মনে হয়। তারা দু শ' বছর উপনিবেশিক বিশ্বকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছিল। তৃতীয় বিশ্ব নামে পরিচিত রাষ্ট্রসমূহ বাহ্যিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করলেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

তাদের হাতেই বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে; কিন্তু তারা আধিপত্যবাদী হওয়ায় বিজ্ঞানের প্রকৃত কল্যাণ থেকে মানবজাতি বঞ্চিত। বিজ্ঞান মানুষের হাতে যত প্রাকৃতিক শক্তি তুলে দিচ্ছে তা মানবজাতির কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের পথেই তারা বেশি ব্যবহার করছে। বিজ্ঞান মানুষের হাতে যে প্রাকৃতিক শক্তি তুলে দেয় তা মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কোনো নির্দেশ দিতে অপারগ। লৌহ যুগে বিজ্ঞান ছুরি ব্যবহার করার ক্ষমতা মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে। এ ছুরি ডাকাতের হাতে পড়লে মানুষের জীবন হরণ, আর ডাক্তারের হাতে পড়লে জীবন রক্ষার কাজে লাগে। বিজ্ঞান ও ছুরির তো কোনো দোষ নেই। ছুরি কী কাজে ব্যবহার করা হবে, সে বিষয়ে বিজ্ঞান কোনো পথনির্দেশ করতে পারে না।

বিজ্ঞান মানুষের হাতে আণবিক শক্তি তুলে দিয়েছে। এ শক্তি মানবকল্যাণেও ব্যবহার করা যায়। আবার আণবিক বোমা বানিয়ে হিরোশিমা ও নাগাসাকির মতো মুহূর্তে গোটা দুনিয়া ধ্বংসও করা যায়।

বন্দুক দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যেমন পালন করা যায়, তেমনি সন্ত্রাস করে খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদিও করা যায়।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যেহেতু divine guidance-এর ধার ধারেন না, সেহেতু তারা বিবেকেরও পরওয়া করেন না। নিজেদের হীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে তারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাতেও দ্বিধা করেন না।

মানবজাতিকে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'লিগ অব নেশনস' গঠিত হয়। কিন্তু যে নেতৃবৃন্দের উপর ঐ সংস্থাকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব ছিল, তারাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিল। ১৯৪৫ সালে চিরতরে



www.amarboi.org

মানবজাতিকে যুদ্ধমুক্ত রাখার অঙ্গীকার ঘোষণা করে জাতিসংঘ কায়েম করা হলো। সে সংস্থাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আমেরিকার নেতৃত্বে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করে গণহত্যা চালানো হলো।

Divine Guidance ছাড়া যে পৃথিবীতে মানবজাতি অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারে না, সে কথা বিশ্বে বহুবার বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে।

## অশান্তি ও বিপর্যয় সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা

'রূম' নামে কুরআনের ৩০ নং অধ্যায়ের ৪১ নং বাক্যে ঘোষণা করা হয়েছে, 'মানুষের নিজ হাতের কামাইয়ের ফলেই জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।' এখানে স্রষ্টা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, হে মানুষ! তোমরা সর্বত্র যে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় ভোগ করছ তা তোমাদেরই সৃষ্ট। অন্য কোনো শক্তি তোমাদের উপর এসব চাপিয়ে দেয়নি।

বিশ্বের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি এ কথার সত্যতাই প্রমাণ করে যে, বিশ্বে অশান্তির জন্য একমাত্র মানুষই দায়ী। স্রষ্টার বিধান না মানার এটাই স্বাভাবিক পরিণাম। গোটা সৃষ্টিজগৎ স্রষ্টার বিধান বাধ্য হয়ে পালন করে বলেই শান্তি ভোগ করছে। মানুষকে স্রষ্টার বিধান মানতে বাধ্য করা হয়নি বলেই মানুষ অবাধ্য হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এর পরিণাম মানুষকেই ভোগ করতে হচ্ছে। যে নেতৃবৃন্দের উপর মানবজাতিকে এ কথা বোঝানোর দায়িত্ব, তারাই এ কথা বোঝেন না। তাহলে জনগণ কেমন করে সঠিক পথের সন্ধান পাবে?

## স্রষ্টা পৃথিবীতেও শাস্তি দিয়ে থাকেন

স্রষ্টার বিধান অমান্য করলে মানবসমাজে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এটাও এক ধরনের শাস্তি। তাছাড়াও অধিকাংশ মানুষ যখন বিবেকের বিরুদ্ধে চলে এবং স্রষ্টার বিধানকে অমান্য করে, তখন স্রষ্টা পৃথিবীতেও শাস্তি দিয়ে থাকেন। আসল শাস্তি তো মৃত্যুর পরপারে নৈতিক জগতে দেওয়া হবে; কিন্তু কিছু শাস্তি তিনি দুনিয়াতেও দেন, যাতে মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়।

তিনি কীভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন, সে কথাও তিনি 'আনআম' নামক কুরআনের ৬ নং চ্যাপ্টারের ৬৫ নং বাক্যে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হে মুহাম্মদ! মানুষকে বলে দিন, স্রষ্টার এ ক্ষমতা আছে যে, তিনি তোমাদের উপর (তিন ধরনের) শাস্তি দিতে পারেন– উপর দিক থেকে, নিচের দিক থেকে এবং তোমাদেরকে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করে।'


www.amarboi.org

মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য স্রষ্টাকে পৃথক কোনো অস্ত্র আবিষ্কার করতে হয় না। তিনি মানুষকে সেবার উদ্দেশ্যে যেসব বস্তু দান করেছেন, সেসবকেই তিনি শাস্তিতে পরিণত করেন। তিনি পৃথিবীর মাটিকে মানুষের জন্য বসবাসের উপযুক্ত করেছেন, তাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু এ মাটি থেকেই উৎপন্ন হয়। তিনি পানিকে মানুষের জন্য জীবনের প্রধান উপকরণ বানিয়েছেন। তিনি মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই বাতাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে পশুর চেয়ে উন্নত মানের জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে আগুন সৃষ্টি করেছেন। আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ করি যে, মাটি, পানি, বাতাস ও আগুন জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক। এগুলো সর্বদা আমাদের সেবা করে চলেছে।

স্রষ্টা যখন কোনো জনপদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন তখন এ সেবকগুলোকেই শাস্তির অস্ত্রে পরিণত করেন। তিনি তিন প্রকারের শাস্তি দেন, যার দু প্রকার ঐ চারটি জিনিস দ্বারা দিয়ে থাকেন।

১. উপর থেকে শাস্তি দেওয়ার মানে হলো— ঝড়-তুফান, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বরফবৃষ্টি, টর্নেডো, হারিকেন, টাইফুন ইত্যাদি।

২. নিচ থেকে শাস্তি হলো— ভূমিকম্প, ভূমিধস, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ, ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড, অরণ্য দহন ইত্যাদি।

৩. গৃহযুদ্ধ। জনগণের মধ্যে বিভিন্ন কারণে বিভেদ সৃষ্টির ফলে এক জনগোষ্ঠী অপর জনগোষ্ঠীকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত হওয়া। গৃহযুদ্ধ যে কত বড় অশান্তি তা কারো অজানা নয়। এটা স্রষ্টার পক্ষ থেকে এক প্রকার শাস্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

## স্রষ্টার নির্দিষ্ট কোনো নাম আছে কি?

কুরআন ও হাদীসে স্রষ্টার ৯৯টি গুণবাচক নাম পাওয়া যায়। আর তাঁর আসল (Proper) নাম তিনি নিজেই 'আল্লাহ' বলে জানিয়েছেন। আর গুণবাচক নামগুলোর একটি হলো 'ইলাহ'। এর অর্থ হচ্ছে হুকুমদাতা প্রভু বা মনিব। যেহেতু মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক হলো প্রভু ও দাসের, হুকুমকর্তা ও পালনকারীর, রাজা ও প্রজার, মনিব ও গোলামের— সেহেতু তিনি এ গুণটির সাথে 'আল' (The) আর্টিক্যাল যুক্ত করে নিজের আসল নাম রেখেছেন আল্লাহ বা একমাত্র হুকুমকর্তা, একমাত্র প্রভু, একমাত্র মনিব।

তিনি বিভিন্ন যুগে তাঁর বাণীবাহকগণের ভাষায় আসল নাম হিসেবে আর কী শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে বিশ্বে তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত। গড, ভগবান, ঈশ্বর, জিহোভা, খোদা প্রভৃতি নামে যারা তাঁকে ডাকেন, তারা যে একমাত্র স্রষ্টাকেই সম্বোধন করেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।


www.amarboi.org

## মানুষ হিসেবে মুহাম্মদের পরিচয়

আল্লাহ যে মানুষটিকে কুরআনের মতো বাণীর বাহক নিয়োগ করলেন, তিনি অতিমানব নন, তবে অবশ্যই মহামানব। যাতে কেউ তাঁকে অতিমানব মনে না করে, সে জন্য আল্লাহ স্বয়ং কুরআনে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন, 'আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। শুধু আমার উপর ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়।'

অর্থাৎ, আমি তোমাদের মতোই পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছি। মানুষ হিসেবে সবার মধ্যে যত দুর্বলতা থাকে আমারও তা আছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোক, হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা অন্য সবার মতো আমারও আছে। শুধু একটি মাত্র পার্থক্য হলো, তোমাদের উপর ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয় না, আমার উপর হয়।

যে সমাজে তিনি ছোট থেকে বড় হলেন, সে সমাজের সবাই তাঁর মানবিক গুণাবলিতে তাঁর প্রশংসা করত। 'মুহাম্মদ' শব্দের অর্থও প্রশংসিত। অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারার এ মানুষটিকে সবাই 'সবচেয়ে সত্যবাদী' ও 'সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত' উপাধিতে ভূষিত করে। যুবক বয়সেই সমবয়সীদেরকে নিয়ে একটি সমিতির মাধ্যমে সমাজসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক তৎপরতার মাধ্যমে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হন এবং জনগণ তাঁকে ঐসব উপাধিতে ভূষিত করে।

খাদীজা নামক এক সম্ভ্রান্ত বিধবা ব্যবসায়ীর কর্মচারী হিসেবে তিনি সততা ও যোগ্যতার এমন পরিচয় দেন, মুগ্ধ হয়ে ৪০ বছর বয়সী ঐ সম্ভ্রান্ত মহিলা ২৫ বছরের যুবক মুহাম্মদকে বিয়ে করেন।

আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, তিনি গোটা মানবজাতির জন্য মুহাম্মদকে সুন্দরতম আদর্শ বানিয়েছেন। তিনি সকলের জন্য আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ প্রতিবেশী, আদর্শ ব্যবসায়ী, আদর্শ নেতা, আদর্শ শাসক, আদর্শ বিচারক ও আদর্শ সেনাপতি। আল্লাহ স্বয়ং যাকে আদর্শ বলে সার্টিফিকেট দিলেন, নিশ্চয়ই তিনি সেরা মানুষ। মানুষ সৃষ্টির সেরা, আর মুহাম্মদ সেরা মানুষ।

## মুহাম্মদ সম্পর্কে অমুসলিম মনীষীদের অভিমত

মাত্র দেড় হাজার বছর পূর্বে মুহাম্মদ পৃথিবীতে মানবসমাজকে উন্নততম সভ্যতার আদর্শ নমুনা উপহার দিতে সক্ষম হন। এর কয়েক হাজার বছর পূর্বেই ঐতিহাসিক যুগ শুরু হয় এবং তখন থেকে ইতিহাস রচিত হতে থাকে। মুহাম্মদ আরবে যে নতুন সভ্যতার জন্ম দেন, এর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে সেকালে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য আরবের উপর আক্রমণ করতে এসে পরাভূত হয় এবং তাদের জনগণ এই উন্নত সভ্যতার সন্ধান পেয়ে পুরনো মতাদর্শ ত্যাগ করে।


www.amarboi.org

এসব ঘটনাবলি ইতিহাসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে। ঐ নতুন সভ্যতার বিরোধী ঐতিহাসিকগণ যত বিকৃতভাবেই ইতিহাস রচনা করে থাকুক, ব্যক্তি মুহাম্মদকে উন্নততম চরিত্রের মানুষ হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

ইতিহাস থেকে তথ্যাবলি অবগত হয়েই পরবর্তী বিভিন্ন যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেক অমুসলিম মনীষী অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত ভাষায় মুহাম্মদের এমন প্রশংসা করেছেন, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে মানবেতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যত মহামানবের সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে সর্বদিক বিবেচনায় মুহাম্মদই মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। এখানে কতক অমুসলিম মনীষীর অভিমত উদ্ধৃত করছি :

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাইকেল এইচ. হার্ট নামক খ্যাতিমান গবেষক মানবজাতির ইতিহাসে যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে মানবসমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন, তাঁদের মধ্যে সেরা ১০০ জনের সংক্ষিপ্ত জীবনীর একটা সংকলন প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'The Hundred'। এর মধ্যে ধর্মনেতা, রাষ্ট্রনায়ক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, বিশ্বজয়ের নেশায় মত্ত মহাবীর, কবি-সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী, সমাজবিপ্লবী, আবিষ্কারক প্রভৃতি সকল প্রকার মানুষের নামই রয়েছে। এমনকি নিন্দনীয় হিটলারের নামও রয়েছে। যেকোনো দিক দিয়েই যারা বিপুলসংখ্যক মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন, তাদের মধ্য থেকে ১০০ জনকে সেরা গণ্য করা হয়েছে। এ ১০০ জনের নামের তালিকায় প্রভাব বিস্তারের মাপকাঠিতে বিচার করে তিনি মুহাম্মদকে প্রথম নম্বরে স্থান দিয়েছেন।

পুস্তকটির সংকলক নিজে খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও যীশুখ্রিস্টকে তৃতীয় স্থান দেওয়ার কারণে যারা আপত্তি তুলেছেন, তাদের জবাব তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় দিয়েছেন।

আমেরিকায় ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটির সপ্তম সংস্করণের ভূমিকার মর্মকথা :

মানবসমাজে, মানবজাতির ইতিহাসে ও সভ্যতার উত্থান-পতনে যাদের প্রভাব রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে আমি সেরা এক শ' জনের তালিকা তৈরি করেছি। তাদের মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি আমার বিবেচ্য নয়। ভালো-মন্দের মাপকাঠিতেও আমি বিচার করিনি। তাই হিটলারের মতো Evil Genius-ও এ তালিকায় স্থান পেয়েছেন। ভূমিকার ১২তম প্যারায় তিনি বলেন,

'আমি মুহাম্মদকে যীশুর উপরে স্থান দিয়েছি। কারণ, আমার বিশ্বাস, যীশুখ্রিস্ট ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে পরিমাণ ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাতে পেরেছেন, মুহাম্মদ ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য এর দ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, মুহাম্মদ যীশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'


www.amarboi.org

মুহাম্মদ সম্পর্কে প্রবন্ধটির শুরুতেই তিনি লিখেছেন, 'বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় মুহাম্মদকে প্রথমে স্থান দেওয়ার আমার এ সিদ্ধান্ত অনেক পাঠককে বিস্মিত করতে পারে এবং অনেকে প্রশ্নও উত্থাপন করতে পারেন; কিন্তু ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে সফলতা লাভ করেছেন।'

'অত্যন্ত দীন-হীন অবস্থায় জীবন শুরু করেও মুহাম্মদ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেন এবং একজন প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হন। আজ তাঁর মৃত্যুর ১৩ শতাব্দী পর তাঁর প্রভাব এখনো প্রবল ও ব্যাপক।'

'এ পুস্তকে যাঁদের নাম রয়েছে তাঁদের অধিকাংশই সভ্যতার কেন্দ্রে, উন্নত সংস্কৃতিমান অথবা রাজনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং গড়ে উঠেছেন। অথচ মুহাম্মদ ৫৭০ সালে দক্ষিণ আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন, যা সেকালে বাণিজ্য, শিল্প ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রসমূহ থেকে বহু দূরে বিশ্বের পশ্চাদ্‌পদ অঞ্চল ছিল।'

'ছয় বছর বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় সাধারণ পরিবেশে তিনি লালিত-পালিত হন। ইসলামী ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি নিরক্ষর ছিলেন। ২৫ বছর বয়সে এক ধনী বিধবাকে বিয়ে করার পর তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। যাহোক, ৪০ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত এমন কোনো বাহ্যিক ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যা দ্বারা বোঝা যায় যে তিনি একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।'

'ঐ সময় প্রায় সব আরবই পৌত্তলিক ছিল, যারা বহু গডে (খোদায়) বিশ্বাস করত। অবশ্য মক্কায় অল্পসংখ্যক ইহুদি ও খ্রিস্টান ছিল। নিশ্চয়ই তাদের নিকট মুহাম্মদ প্রথম এক অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান গড সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। যখন তাঁর বয়স ৪০ বছর পূর্ণ হয় তখন তিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করলেন যে, এই একমাত্র সত্য গড (খোদা) তাঁর সাথে কথা বলেছেন এবং ঐ সত্য ধর্মমত প্রচার করার জন্য তাঁকে মনোনীত করেছেন।'

এটুকু লেখার পর সংক্ষেপে তিনি মুহাম্মদের উত্থান ও ৬৩০ সালে মক্কা বিজয়ের বর্ণনা উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, '৬৩২ সালে মুহাম্মদ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তিনি গোটা আরবের মহাক্ষমতাশালী শাসক।'

লেখক এরপর মুহাম্মদের অনুসারীদের ঐতিহাসিক বিজয়াভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে লিখেন, '৭১১ সালে আরব বাহিনী গোটা উত্তর-আফ্রিকা দখল করে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত পৌঁছে গেল।'


www.amarboi.org

এক স্থানে তিনি উল্লেখ করেন, 'এটা বাস্তব সত্য যে, আরব বাহিনীর বিজয়াভিযানের চালিকাশক্তি হিসেবে মুহাম্মদ সর্বকালের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা।'

প্রবন্ধটিতে বিশ্বের কতক বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনার নায়কদের উদাহরণ উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেছেন, ঐতিহাসিক কার্যকারণেই ঐসব ঘটনা ঘটেছে। ঐসব নায়ক না হলেও অন্য কেউ নায়কের ভূমিকা পালন করত; কিন্তু যে আরবশক্তি হঠাৎ মরুভূমি থেকে উঠে বিশ্ব জয় করে ফেলল, মুহাম্মদের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব ছাড়া তা কখনো সম্ভব হতো না।

প্রবন্ধের শেষ প্যারায় তিনি লিখেছেন, 'তাহলে আমরা দেখছি যে, সপ্তম শতাব্দীর আরবদের বিশ্ববিজয় আজও মানবজাতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অব্যাহত রেখেছে। এটাই পার্থিব ও ধর্মীয় ক্ষেত্রের ঐ সমন্বিত অতুলনীয় প্রভাব, যার কারণে আমি অনুভব করি যে, মানবেতিহাসে মুহাম্মদকেই এককভাবে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনার যোগ্য অধিকারী বানিয়েছে।

২. প্রফেসর কেএস রামাকৃষ্ণ রাও। তিনি ভারতের মহীশুরের এক মহিলা কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান ছিলেন। 'Muhammad- The Prophet of Islam' নামক মাত্র ৩০ পৃষ্ঠার পুস্তিকাতে তিনি মুহাম্মদের জীবন, শিক্ষা ও সাফল্যের অনবদ্য চিত্র অত্যন্ত আকর্ষণীয় ইংরেজি ভাষায় তুলে ধরেছেন। এর সবটুকুর অনুবাদ এখানে উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করে মাত্র কয়েকটি প্যারা উদ্ধৃত করছি। তিনি বইটিতে মুহাম্মদ সম্পর্কে কয়েকজন মনীষীর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে কিছু উদ্ধৃত করছি :

'এক বর্বর যুগে যুদ্ধের ময়দানেও তিনি মানবতা কায়েম করেছেন। তিনি কড়া নির্দেশ দিলেন যে, আত্মসাৎ করা, প্রতারণা করা, বিশ্বাস ভঙ্গ করা, অঙ্গহানি করা, শিশু-মহিলা-বৃদ্ধ হত্যা করা, ফলের গাছ কাটা, উপাসনারত ধার্মিককে উৎপীড়ন করা চলবে না। তাঁর চরম শত্রুর সাথে তাঁর আচরণ তাঁর অনুসারীদের জন্য সবচেয়ে মহান উদাহরণ হয়ে আছে।'

'মক্কা বিজয়ের পর তিনি ক্ষমতার শীর্ষে। মক্কায় যারা তাঁর বাণী শুনতে অস্বীকার করল, তাঁর ও তাঁর সাথীদের উপর নির্যাতন চালাল, তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল, তাঁর অনুসারীদেরকে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করল, ... যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী তিনি তাদের সকল প্রকার নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তাদের সাথে কেমন আচরণ করলেন? মুহাম্মদের অন্তরে ভালোবাসা ও দয়ার বন্যা বয়ে গেল। তিনি ঘোষণা করলেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো দোষারোপ নেই, তোমরা মুক্ত।'


www.amarboi.org

'সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের নীতি ও মানবজাতির সাম্যের যে মতবাদ তিনি ঘোষণা করলেন তা মানবজাতির সামাজিক উন্নয়নে মুহাম্মদের বিরাট অবদান। সকল বড় ধর্মই এসব প্রচার করেছে; কিন্তু মুহাম্মদ তা বাস্তবায়িত করেছেন।'

'ভারতের বিখ্যাত কবি সরোজিনী নাইডু ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্যে বলেন, এটাই প্রথম ধর্ম যা গণতন্ত্র প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছে। ... প্রতিদিন পাঁচ বার মসজিদে রাজা ও প্রজা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাঁটু গেড়ে নত হয়ে বলে, আল্লাহ মহান্।'

'মহাত্মা গান্ধী তাঁর অনুপম বাচনভঙ্গিতে বলেন, কেউ বলেছে যে, স্যাউথ আফ্রিকার অধিবাসী ইউরোপীয়রা ইসলামের আগমনকে ভয় করে, যে ইসলাম স্পেনকে সভ্যতা শিখিয়েছে, যে ইসলাম আলোর মশাল মরক্কোতে পৌঁছিয়েছে এবং গোটা বিশ্বে ভ্রাতৃত্বের সুসমাচার প্রচার করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয়রা ইসলামকে এ কারণে ভয় পায় যে, ইসলাম সাদা চামড়াওয়ালাদের সাথে কালোদের সাম্য দাবি করবে।'

'ইসলামের এই গণতান্ত্রিক মানসিকতাই মহিলাদেরকে পুরুষদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছে। স্যার এডওয়ার্ড আর্চিবল্ড হেমিল্টন বলেন, ইসলাম বলে যে, মানুষ জন্মগতভাবে নিষ্পাপ। ইসলামের মতে, নারী ও পুরুষ একই উপাদানে সৃষ্ট, একই রকম আত্মার অধিকারী এবং একই মানের বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষ অর্জনের যোগ্য।'

'ইসলাম মহিলাদেরকে পিতা-মাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিত্ব দিয়েছে ও সম্পদের মালিকানার অধিকার দিয়েছে। এর ১২ শ' বছর পর গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলে গণ্য ইংল্যান্ড মাত্র ১৮৮১ সালে 'The Morziea women's Act' পাস করে ইসলামের এ প্রতিষ্ঠানটিকে গ্রহণ করেছে।'

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকায় লেখা আছে, 'সকল প্রফেট ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে মুহাম্মদই সর্বাপেক্ষা সফল।'

'মুহাম্মদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা করা কঠিন। ... মুহাম্মদ একাধারে প্রফেট, জেনারেল, কিং, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রচারক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, বাগ্মী, সংস্কারক, অনাথদের আশ্রম, দাসদের রক্ষক, নারীর মুক্তিদাতা, বিচারক এবং ঋষি। এসব মহৎ ভূমিকায়ই তিনি একজন হিরো (ইতিহাসের নায়ক)।'

'প্রবাদ আছে যে, একজন সৎ মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মুহাম্মদ সত্যের চেয়ে বেশি গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর হাতের মজ্জা পর্যন্ত মানবীয় ছিলেন। মানবিক সহানুভূতি ও মানবিক ভালোবাসা তাঁর আত্মার সুর ছিল। মানুষের সেবা


www.amarboi.org

করা, মানুষকে উন্নত করা, মানুষকে পবিত্র করা, মানুষকে শিক্ষিত করা, এক কথায় মানুষকে মানুষ বানানোই তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল।'

'তিনি খুবই আড়ম্বরহীন ও নিঃস্বার্থ ছিলেন। তিনি কী উপাধি ধারণ করলেন? মাত্র দুটো উপাধি– আল্লাহর দাস ও তাঁর বাণীবাহক। প্রথমেই দাস, পরে বাণীবাহক।'

৩. ব্রিটিশ নাট্যকার ও সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ডশ তাঁর 'Genuine Islam' নামক বইয়ে লিখেন,

'আমি বিশ্বাস করি যে, যদি মুহাম্মদের মতো একজন মানুষ আধুনিক বিশ্বের একনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি যাবতীয় সমস্যার এমন সমাধান করতে সক্ষম হতেন, যা কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সুখ আনয়ন করত। আমি মুহাম্মদের মতাদর্শ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, আজকের ইউরোপ যেমন তা গ্রহণ করতে শুরু করেছে, আগামী দিনের ইউরোপের নিকটও তা গ্রহণযোগ্য হবে। আগামী ১০০ বছরের মধ্যে যদি কোনো ধর্ম ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পায় তাহলে তা হবে একমাত্র ইসলাম। আমার মনে হয়, এটাই একমাত্র ধর্ম, যা প্রতি যুগের পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা রাখে।'

৪. ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট 'The Hundred' বইয়ের ৩৪ নম্বরে আছেন। তিনি বলেন, 'যীশুখ্রিস্টের ৬ শতাব্দী পর আরব দেশ পৌত্তলিক ছিল। মুহাম্মদ সেখানে ইবরাহীম, ইসমাঈল, মূসা ও ঈসার গডকে আরাধনা করার নিয়ম প্রচলন করেন। ... মুহাম্মদ ঘোষণা করেন, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো গড নেই।'

'আমি আশা করি ঐ সময় বেশি দূরে নয়, যখন আমি সকল দেশের জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হব এবং কুরআনের নীতির ভিত্তিতে এমন একটি সর্বসম্মত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করব, যা একমাত্র সত্য এবং শুধু তা-ই মানুষকে সুখ-শান্তির পথে নিয়ে যেতে পারবে।'

৫. ভারতের মি. ভেনকট রতনাম (Ratnam) তাঁর 'An Essay on Islam' নামক পুস্তকের ১৫২ পৃষ্ঠায় লিখেন, 'মুহাম্মদ শিক্ষা দেন যে, সত্যিকার গড একজনই, আর কেউ নন। তিনি একাই সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ভালোবাসা ও করুণার সাথে বিশ্বকে পরিচালনা করেন। ... স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কোনো মাধ্যম থাকার কথা মুহাম্মদ অস্বীকার করেন। তিনি মানুষকে সরাসরি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা ও ক্ষমা চাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।'


www.amarboi.org

একই পুস্তকের ২০৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন, 'মুহাম্মদের ইসলামের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও বলিষ্ঠ নৈতিকতা এ কথা প্রমাণ করেছে যে, এটাই একমাত্র বাস্তবসম্মত ধর্মমত। প্রফেট মুহাম্মদ বিশ্বের জন্য অন্য সবার চেয়ে বেশি কল্যাণ করেছেন।'

৬. প্রফেসর রমেশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর 'Constitutional Development in the Islamic world' নামক পুস্তকে লিখেন, 'বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ধর্মের মধ্যে ইসলাম সর্বশেষে এসেছে। এ সত্ত্বেও অন্য কোনো ধর্ম স্রষ্টার একত্ববাদ ও মানুষের সাম্যের কথা এত জোরালোভাবে ও অব্যাবহতভাবে তুলে ধরেনি।'

৭. মিসেস এনি বেসান্ত (Annie Besant) খ্রিস্টান ধর্মযাজক ছিলেন। ১৮৮৫ সালে তারই উদ্যোগে ব্রিটিশ শাসনামলে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' দলটি গঠিত হয়। মুহাম্মদ সম্পর্কে তার তিনটি ছোট্ট মন্তব্য :

শৈশব থেকে ৪০ বছর বয়সের জীবনে মক্কাবাসী তাঁর চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'আলআমীন' (সবচেয়ে বিশ্বস্ত) ও 'আস্‌সাদিক' (সবচেয়ে সত্যবাদী) উপাধিতে ভূষিত করে। সে বিবরণ দিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, 'তাঁর মধ্যে একজন বীর (Hero), একজন জন্মগত নেতা (Born leader) ও একজন মানবশিক্ষক (Teacher of men)-এর উপাদান দেখা গেল।'

মুহাম্মদ ঐশী প্রত্যাদেশ লাভ করার পর এর আকস্মিকতায় ভীত হয়ে স্ত্রীর নিকট তা প্রকাশ করলে স্ত্রী মুহাম্মদকে সান্ত্বনা দিয়ে যা বললেন, তা উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন, 'এ প্রিয় স্ত্রী তাঁর প্রথম শিষ্য হন। ঐ মহান মহিলা ২৬ বছর জনগণের ঐ নেতার সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করেন। স্ত্রীর চেয়ে আর কে স্বামীকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতে পারে? এমনই ছিল মুহাম্মদের চরিত্র।'

তিনি মুহাম্মদের সরল জীবনের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'তাঁর জীবন কত সরল ও মিতব্যয়ী! তিনি নিজের হাতে তাঁর জুতা মেরামত করতেন ও কাপড়ে তালি লাগাতেন। এমনই ছিল তাঁর চরিত্র– এত সরল, এত মহান ও এত সৎ!'

৮. পাটনার প্রিন্সিপ্যাল ডিএন সেন লিখেন, 'আমাদের নিকট মুহাম্মদের প্রথম উপহার হলো– তাঁর শৈশবের মোহনীয়তা, শিষ্টতা ও সরলতা। দ্বিতীয় হলো– তাঁর যৌবনকালের সত্যবাদিতা ও সাধুতা, যা তাঁর গোটা জীবনের বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় হলো– স্রষ্টার সিদ্ধান্তে অবিচল ও গভীর বিশ্বাস, যা তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি। চতুর্থ হলো– উচ্চাশা, যা তাঁকে বিপদে ভরসা দিয়েছে এবং তাঁর স্নায়ু


www.amarboi.org

ও আত্মাকে সাহস যুগিয়েছে। পঞ্চম হলো– তাঁর মরমি দর্শন শক্তি, যা জীবনের অন্ধকার দিগন্তে তাঁকে আলো দান করেছে। ষষ্ঠ হলো– তাঁর বদান্যতা, যা তাঁকে গরিবের বন্ধু বানিয়েছে। গোটা মানবতার প্রতি তাঁর সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ উপহার হলো– স্রষ্টার একত্বের অনুপম বাণী, যা স্বর্গীয় প্রভাবে অনুপ্রাণিত ও তাঁর মহান আত্মার গভীরতা থেকে উৎসারিত।'

৯. এডিনবরা ইউনিভার্সিটির প্রিন্সিপ্যাল ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের বৈদেশিক বিভাগীয় মন্ত্রী উইলিয়াম মুর (Muir) তাঁর 'মুহাম্মদের জীবনী' গ্রন্থে লিখেন, 'অনাদিকাল থেকে মক্কা ও আরব উপদ্বীপের জনগণ কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা ও অপরাধে ডুবে ছিল। ... তাদের মধ্যে যে চরম বিভেদ ছিল, তা আর কোথাও পাওয়া কঠিন। হঠাৎ এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। এক লোক (মুহাম্মদ) দাঁড়িয়ে গেলেন, যিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ঐশী নির্দেশনার (Divine Guidance) দাবি নিয়ে ঐসব যুদ্ধরত দলগুলোকে বাস্তবে ঐক্যবদ্ধ করে অসম্ভবকে সম্ভব করে দিলেন।'

## মুহাম্মদ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

### মুহাম্মদ অতিমানব নন

কুরআনে আল্লাহর দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী মুহাম্মদ সবাইকে জানিয়ে দেন যে, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। পার্থক্য শুধু এই যে, সবার নিকট আল্লাহ বাণী পাঠান না, আমার নিকট পাঠান। আমাকে তিনি যতটুকু জ্ঞান দান করেন, এর বেশি অদৃশ্য জগতের কিছুই আমি জানি না। আমি আল্লাহর দাস ও বাণীবাহক মাত্র। আমি অতিমানবও নই, অবতারও নই।

মুহাম্মদ কোনো রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর বংশ উচ্চ হলেও দরিদ্র পরিবারেই তাঁর জন্ম। জন্মের পূর্বেই তিনি পিতৃহারা হন। মাত্র ছয় বছর বয়সে মাকেও হারান। প্রথমে দরিদ্র দাদা ও পরে অসচ্ছল চাচা তাঁকে লালন-পালন করেন।

তিনি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তেমন প্রচলনই ছিল না। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। অবশ্য সকল মানবীয় গুণাবলির অধিকারী ছিলেন বলে তিনি সমাজে সবচেয়ে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হিসেবে গণ্য ছিলেন। যুবক বয়সেই 'হিলফুল ফুযূল' নামক একটি সমাজসেবা সংগঠনের


www.amarboi.org

মাধ্যমে সবার প্রশংসা কুড়ান। তাঁর সুনামের কারণেই খাদীজা নামে মক্কার এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী মহিলা তাঁকে কর্মচারী নিয়োগ করেন। তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে খাদীজা তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ, আর খাদীজার বয়স চল্লিশ বছর। বয়সে এতটা অসম ও বিধবা হওয়া সত্ত্বেও খাদীজার গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে জীবনসাথী হিসেবে গ্রহণ করেন।

## সমাজসেবক মুহাম্মদ

মানবসেবা করতে গিয়ে তিনি সমাজের মধ্যে যেসব মানবীয় সমস্যা রয়েছে, সে সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। অবিচার, অনাচার, হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতারণা, শোষণ প্রভৃতির দরুন সাধারণ মানুষ যে দুঃখ-বেদনা-নির্যাতন সহ্য করছে, তা দূর করে সমাজে কেমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে বিষয়ে তিনি রাত-দিন ভাবতে থাকেন এবং সাধ্যমতো সমাজকে সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যান; কিন্তু যে শান্তি তাঁর কামনা তা পূরণ না হওয়ায় তিনি স্রষ্টার দরবারে ধরনা দেন। মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর নির্জন অবস্থায় কাটাতেন। মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে সুউচ্চ এক পাথরের পাহাড়ের চূড়ার এক গুহায় তিনি কখনো কখনো ২/৩ দিন একাধারে একা ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। (পাহাড়টি এত উঁচু যে, আমি দু বার বিশ্রাম নিয়ে চূড়ায় পৌঁছতে পেরেছি। যে গুহায় তিনি বসতেন, সেখানেও গিয়েছি– লেখক।)

## ঐশী বাণীবাহক মুহাম্মদ

তাঁর বয়স যখন ৪০ বছর পূর্ণ হয় তখন একদিন ঐ গুহায় ঐশী দূত মানুষের আকারে উপস্থিত হন। তিনি অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। একজন মানুষ হিসেবে এমনটা হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। ঐ দূত একটি আরবী লেখা তাঁর সামনে ধরে পড়তে বললেন। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। ঐশী দূত আল্লাহর বাণী আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলে তিনি তা মুখস্থ করে নেন।

তিনি পূর্বে এমন কোনো পরিকল্পনা করেননি যে, নিজেকে ঐশী বাণীবাহক হিসেবে দাবি করবেন। একজন সরলমনা মানবদরদি মানুষ হিসেবে কীভাবে জনগণের কল্যাণ করা যায়, সে চিন্তা করছিলেন। তাঁর জীবনে এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে বলে কোনো ধারণাই তাঁর ছিল না। ঘটনার আকস্মিকতায় ভীত হওয়ার দরুন তাঁর গায়ে জ্বর এসে যায়। তিনি অস্থিরচিত্তে বাড়িতে ফিরে তাঁর স্ত্রীকে বারবার বলতে লাগলেন, আমাকে কম্বলে জড়িয়ে দাও।


www.amarboi.org

তাঁর স্ত্রী প্রিয়তম স্বামীর অস্থির অবস্থা দেখে বেশ চিন্তান্বিত হয়ে তাঁকে শয্যা পেতে দিলেন এবং কম্বল দিয়ে গা ঢেকে দিলেন; পাশে বসে কপালে হাত বুলিয়ে জানতে চাইলেন যে, কী ব্যাপার ঘটে গেল, যার দরুন এমন অস্থির হয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন?

তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর গোটা ঘটনা বর্ণনা দিলেন। পূর্ণ বিবরণ শুনে তাঁর স্ত্রী পরম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি বাণী প্রেরিত হয়েছে। আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, আপনি সব সময় মানুষের উপকার করেন। আপনি বিধবা ও অনাথদেরকে সাহায্য করেন। মানুষে মানুষে বিবাদ দেখা দিলে মীমাংসা করে দেন। মানুষের বিপদাপদে সব সময় তাদের পাশে দাঁড়ান। সাংগঠনিকভাবে যুবক বয়স থেকেই তিনি সমাজসেবার যে কার্যক্রম করে এসেছেন, সেসব উল্লেখ করে তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, এমন ভালো মানুষের কোনো অমঙ্গল আল্লাহ করেন না। স্ত্রীর আশ্বাসবাণীতে তিনি সুস্থির হন।

কিছু দিন পর ঐশী দূত এসে মুহাম্মদকে জানালেন যে, আল্লাহ আপনার উপর এক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আপনি জনগণকে আহ্বান জানাতে থাকুন, যেন তারা হুকুমকর্তা হিসেবে একমাত্র আল্লাহকেই মেনে নেয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। মানুষ মানুষের দাস হতে পারে না। সব মানুষ একমাত্র আল্লাহর দাস। আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কোনো মানুষের হুকুম মানা উচিত নয়। কোনো মানুষের মনগড়া নির্দেশ দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। একজন মানুষ কেন অন্য কোনো মানুষের মনগড়া হুকুম মেনে চলবে? সবাইকে একমাত্র আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে চলতে হবে।

## ঐশী বাণী-প্রচারক মুহাম্মদ

ঐশী নির্দেশ পেয়ে মুহাম্মদ সমাজে তা প্রচার করা শুরু করলেন। সমাজসেবা ও চারিত্রিক মাধুর্যের কারণে তিনি যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, এর ফলে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করলেন। বিশেষ করে সমাজের নির্যাতিত ও অধিকারহারা গরিব মানুষই বেশি আকৃষ্ট হন।

যারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের উপর নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছিল তারা মুহাম্মদের ডাকে জনগণকে সাড়া দিতে দেখে অস্থির হয়ে পড়ল। তারা তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হারানোর আশঙ্কা করল। তারা হিসাব করে দেখল যে, জনগণ যদি বেশি সংখ্যায় মুহাম্মদকে মেনে নেয়, তাহলে আল্লাহর হুকুমের নামে সে যে নির্দেশই দেয় তা-ই তারা মেনে চলবে। তাদেরকে জনগণ আর নেতা মানবে না।


www.amarboi.org

যে সমাজব্যবস্থা চালু থাকে তা বহাল থাকলে যে নেতাদের স্বার্থ কায়েম থাকে, তাদেরকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় 'কায়েমি স্বার্থ' বলা হয়। তারা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চায় না। কেউ সমাজব্যবস্থার সংশোধনের চেষ্টা করলে তারা অবশ্যই বাধা দেয়। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সকল প্রচেষ্টাকে সর্বশক্তি দিয়ে তারা প্রতিহত করতে চায়।

## মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থের প্রতিরোধ

মুহাম্মদের ঐ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কায়েমি স্বার্থের পক্ষ থেকে প্রথমে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলে। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে তাঁর জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা চালানো হয়। এরপরও জনগণকে বিভ্রান্ত করতে ব্যর্থ হয়ে তারা মুহাম্মদের অনুসারীদের উপর নির্যাতন চালিয়ে জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার অপকৌশল গ্রহণ করে। এত কিছু করা সত্ত্বেও মুহাম্মদের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। শেষ পর্যন্ত তিনি আল্লাহর হুকুমে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে মদিনায় চলে যান।

বাণীবাহকের দায়িত্ব পাওয়ার পর ১৩ বছরে যারা তাঁর অনুসারী হন, তাঁদেরকে তিনি আদর্শিক, নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলিতে গড়ে তোলেন। তিন বছর থেকে মদিনার বড় দুটো গোত্রের নেতৃবৃন্দ মক্কা থেকে ৫ কিলোমিটার দূরবর্তী 'আকাবা' নামক স্থানে এসে মুহাম্মদের মতাদর্শ গ্রহণ করে তাঁকে মদিনায় যাওয়ার প্রস্তাব দেন। সে অনুযায়ী তিনি সেখানে যান।

## ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা

মদীনায় পৌঁছার পর তাঁর নেতৃত্বে ইসলামী সরকার গঠিত হয়। সরকার কায়েম হওয়ার পর থেকে ঐশী বাণীর মাধ্যমে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধান অবতীর্ণ হতে থাকে এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের মাঝে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মক্কার নেতৃবৃন্দ এ নতুন রাষ্ট্র ও সরকারকে ধ্বংস করার জন্য বারবার হামলা চালিয়েও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। পাঁচ বছর পর্যন্ত তাদের হামলা চলে। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এর পর তিন বছরে মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র সম্প্রসারিত হতে থাকে।

নতুন সমাজব্যবস্থার জনকল্যাণকর তৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে আরো অনেক এলাকার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। জনগণ সবাই সুখ-শান্তি চায়। পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থায় তারা কী পেয়েছে আর নতুন সমাজব্যবস্থায় কী পাওয়া যাচ্ছে, এর


www.amarboi.org

তুলনা করে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আল্লাহর দাসত্ব ও মুহাম্মদের নেতৃত্ব মানার জন্য মানুষ আগ্রহী হয়।

মদিনায় ইসলামী সমাজব্যবস্থার খবর সারা আরবেই ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি মক্কায়ও অধিকাংশ মানুষ মুহাম্মদের মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে যায়। এ খবরও মদিনায় পৌঁছে গেল।

## মক্কা বিজয়

যে মক্কা থেকে মুহাম্মদকে লুকিয়ে চলে যেতে হয় মাত্র আট বছরের ব্যবধানে তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে সে মক্কায়ই প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। এটা টের পেয়ে মক্কার প্রধান নেতা স্বয়ং মুহাম্মদের সাথে যোগাযোগ করে মক্কায় তাঁদের প্রবেশে বাধা না দেওয়ার অঙ্গীকার করে।

সুতরাং মুহাম্মদ বিনা বাধায় তাঁর জন্মভূমিতে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করে ঘোষণা করেন যে, 'আজ কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। মক্কাবাসী সবাই মুক্ত।' ১৩ বছর পর্যন্ত যারা তাঁর ও তাঁর সাথীদের চরম বিরোধিতা করল, দেশ থেকে বিতাড়িত হতে বাধ্য করল, বিগত পাঁচ বছর মদিনায় বারবার আক্রমণ করল, তাদেরকে তিনি যুদ্ধের সর্বসম্মত নিয়মেই শাস্তি দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। তাঁর মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে সবাই দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদের নেতৃত্বকে আবেগের সাথে মেনে নেয়। তাঁদের প্রিয় মানুষটিকে নেতা হিসেবে পেয়ে তাঁরা উল্লসিত হয়।

মানুষ স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি। মুহাম্মদ তাঁর প্রিয় দাস ও বাণীবাহক। ব্যক্তিগত বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে যারা দেশ দখল করে, তাদের মতো আচরণ তিনি করতে পারেন না। নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার হীন উদ্দেশ্যে যারা দেশ জয় করে তিনি তাদের মধ্যে গণ্য হতে পারেন না। তিনি মানবতার বন্ধু। প্রভুর প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে নিজের অধীন বানানোর পরিবর্তে একমাত্র স্রষ্টার অনুগত হওয়ার শিক্ষা দেওয়াই তাঁর জীবনের মিশন ছিল।

## সহজ-সরল জীবনযাপন

সম্রাট হয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসিতার জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে তিনি কোনো কাজ করেননি। তিনি যখন গোটা আরবের নেতা এবং তাঁর সাথীগণ যখন বিজয়ী হিসেবে সচ্ছল জীবন যাপন করছিলেন, তখনো তিনি আগের মতোই দরিদ্র জীবন অব্যাহত রাখেন। তিনি মানুষকে দুনিয়ার রূপ-রস উপভোগ করার শিক্ষা দেননি। আবার বৈধ পথে পৃথিবীতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতেও তিনি নিষেধ করেননি।


www.amarboi.org

গোটা আরবের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে তিনি যখন পরলোক গমন করেন, তখন কোনো সম্পদ রেখে যাননি। বলে গেলেন, 'নবীর সম্পদে কোনো উত্তরাধিকারী হয় না। যদি কিছু থাকে, তা গরিবদের মাঝে বিলি-বণ্টন হবে।'

## উন্নততম চরিত্রের অধিকারী

মানুষ হিসেবে ব্যক্তিচরিত্রের এমন আদর্শ তিনি রেখে গেছেন, যাতে চিরকাল মানবজাতির নিকট তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে স্বীকৃত হবেন। ব্যক্তিগতভাবে কখনো তিনি কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেননি। কারো প্রতি সামান্য কটূক্তিও তিনি করেননি। আনাস নামক তাঁর এক সাথী যিনি দশ বছর তাঁর খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তিনি বলেন, 'কোনো দিন তাঁকে বলা হয়নি যে, এ কাজটা তুমি কেন করলে বা কেন করলে না?' মানবজাতির ইতিহাসে কি এর কোনো নজির আছে?

তাঁর আচরণে কোনো মানুষ সামান্যতম অসন্তুষ্ট হয়েছে বলেও কোনো প্রমাণ নেই। তিনি বলেছেন, 'উন্নত মানের চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।'

## নবী-রাসূলের দায়িত্ব কী?

কুরআনে মুহাম্মদকে নবী ও রাসূল বলা হয়েছে। এ দুটো আরবী শব্দের অর্থ হলো 'সংবাদবাহক' ও 'বাণীবাহক'। যুগে যুগে বিভিন্ন জনপদে নবী পাঠানো হয়েছে বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআনে মোট ২৫ জন নবী ও রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁদের প্রথম হলেন মানবজাতির আদিপিতা প্রথম মানুষ আদম এবং সর্বশেষ হলেন মুহাম্মদ। কুরআনে আরো বলা হয়েছে, মুহাম্মদের পূর্ব পর্যন্ত এমন কোনো উল্লেখযোগ্য জনপদ নেই, যেখানে নবী পাঠানো হয়নি।

মানবজাতির নিকট স্রষ্টার বাণী শুধু শুনিয়ে দেওয়ার দায়িত্বই তিনি পালন করেননি। স্রষ্টা তাঁকে সে বাণীর প্রকৃত ব্যাখ্যাতার দায়িত্বও দিয়েছেন। কুরআনে মানবজাতির জন্য যে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান পাঠানো হয়েছে, তা বাস্তবে পূর্ণরূপে রূপায়িত করার মহান দায়িত্ব পালন করেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

কুরআনের তিনটি অধ্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে, 'রাসূল মুহাম্মদকে মানবরচিত মনগড়া ভ্রান্ত বিধানের উপর স্রষ্টার দেওয়া বিধানকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে।' আরেক অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'সকল রাসূলকেই মানবাধিকার কায়েম করে পূর্ণ ন্যায়ানুগ সমাজব্যবস্থা চালু করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'


www.amarboi.org

এর দ্বারা বোঝা গেল, নবী-রাসূলগণকে শুধু ধর্মনেতার দায়িত্বই দেওয়া হয়নি; জনগণকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্যিকার চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে আদর্শ মানবসমাজ ও শান্তিময় রাষ্ট্র গঠনের গুরুদায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। মুহাম্মদ যে এসব দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করে গেছেন, সে কথা ইতিহাস স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

## উপসংহার

আমার প্রিয় অমুসলিম ভাই ও বোনদের নিকট আমার আকুল আবেদন এই যে, আপনারা অত্যন্ত খোলা মন নিয়ে নিজের ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গল চিন্তা করে আমার লেখা বক্তব্য বিবেচনা করুন। আপনাদের কল্যাণ কামনা করেই আমি লিখেছি। পৃথিবীতে যে পরিবেশেই বসবাস করছেন, এ জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আর মৃত্যুর পর রয়েছে অনন্ত অসীম জীবন। মৃত্যুর পর সেই অনন্ত অসীম জীবনে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি লাভের চেষ্টা না করে পার্থিব জীবনে যত কিছুই অর্জন করা হোক, তা পরপারে কোনো কাজেই আসবে না।

আমার দেহের জন্য স্রষ্টা যে বিধান দিয়েছেন, তা মেনে চললে যেমন সুস্বাস্থ্য নিয়ে সুখ-শান্তিতে বেঁচে থাকা সম্ভব, তেমনি আমার কর্মজীবনের জন্য তিনি যে বিধান দিয়েছেন, তা মেনে চললেই ইহকালে শান্তি ও পরকালে সুখ পাওয়া যাবে। এটাই সাধারণ যুক্তির দাবি।

পরকালের অনন্ত অসীম জীবনে প্রকৃত সাফল্য লাভের চিন্তা বাদ দিয়ে ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার জীবন যাপন করা চরম বোকামি। মৃত্যুর পর আবার একটি জীবন আছে বলে স্রষ্টার সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআন অগণিত যুক্তিসহকারে নিশ্চিত দাবি করছে। এ দাবিকে অসত্য প্রমাণ করার সাধ্য কারো নেই। এ পর্যন্ত কেউ তা পারেনি।

তাই পরকালের কথা বিশেষ বিবেচনায় রেখেই সবাইকে পার্থিব জীবনে চলার পথ বাছাই করতে হবে।

এ পুস্তকের সকল পাঠক-পাঠিকাকে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাদের বিবেক-বুদ্ধি সাহায্য করুক– এটাই আন্তরিকভাবে কামনা করছি এবং সকলের ইহকালীন ও পরকালীন সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

সমাপ্ত


www.amarboi.org

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড